ইউনিট ৪: বাংলাদেশের উচ্চশিক্ষা

ভূমিকা

আধুনিক সমাজের উন্নতি সেই সমাজের উচ্চশিক্ষার প্রকৃতি ও ধরনের উপর অনেকাংশে নির্ভরশীল। দক্ষ মানবসম্পদ সৃষ্টিতে উচ্চশিক্ষার গুরুত্ব অপরিসীম। বিশ্বায়নের এই সীমাহীন প্রতিযোগীতায় যুগে উচ্চশিক্ষায় শিক্ষিত সমাজ অতীব জরুরী।

একটা সময় ছিল যখন বাংলাদেশে উচ্চশিক্ষাকে বিলাসিতা বলে গন্য করা হতো। গত শতাব্দী থেকে উচ্চশিক্ষার ব্যাপক বিস্তার ঘটেছে। দারিদ্রতা দূরীকরণ এবং উন্নয়নে উচ্চশিক্ষার ভূমিকা ব্যাপক।

মানসম্মত শিক্ষাই জাতীয় উন্নয়নের পূর্বশর্ত। উন্নত জাতি বির্নিমানে উচ্চশিক্ষার বিকল্প নেই। বাংলাদেশে উচ্চশিক্ষার পরিধি প্রতিনিয়ত সম্প্রসারিত হচ্ছে, গড়ে উঠেছে নতুন নতুন কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়। বিশ্ব পরিপ্রেক্ষিতে উচ্চশিক্ষা পর্যায়ে মানসম্মত, জীবনমূখী ও প্রয়োগধর্মী শিক্ষা সুনির্দিষ্টকরণের পাশাপাশি গবেষণার মাধ্যমে বাংলাদেশকে একটি জ্ঞানভিত্তিক উন্নত দেশে উন্নীত করার লক্ষে বর্তমান সরকারের প্রচেষ্টা অব্যাহত রয়েছে। এ ইউনিটে উচ্চশিক্ষার কাঠামে, প্রকারভেদ, ব্যবস্থাপনা ও অর্থায়নসহ বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশন ও চ্যালেঞ্জসমূহ সংক্রান্ত পাঁচটি পাঠে আলোচনা করা হল।

এ ইউনিটের পাঠসমূহ–

পাঠ ৪.১: উচ্চশিক্ষার বর্তমান কাঠামো, সুযোগ ও অংশগ্রহণ

পাঠ ৪.২: উচ্চশিক্ষার প্রকারভেদ: বিশ্ববিদ্যালয়, কলেজ ও অন্যান্য প্রতিষ্ঠানসমূহ

পাঠ ৪.৩: উচ্চশিক্ষায় ব্যবস্থাপনা ও অর্থায়ন

পাঠ ৪.৪: বাংলাদেশের বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশন

পাঠ ৪.৫: উচ্চশিক্ষার প্রধান প্রধান বিবেচ্যদকিসমূহ (ইস্যু) ও প্রতিবন্ধকতাসমূহ

পাঠ ৪.১: উচ্চশিক্ষার কাঠামো, সুযোগ ও অংশগ্রহণ

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি–

- উচ্চশিক্ষার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য বর্ণনা করতে পারবেন।
- উচ্চশিক্ষার কাঠামোগত বিন্যাস বর্ণনা করতে পারবেন।
- সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে উচ্চশিক্ষার বর্তমান সুযোগ ও অংশগ্রহণ ব্যাখ্যা করতে পারবেন।
- সরকারী ও বেসরকারী উচ্চশিক্ষার সুযোগ বর্ণণা করতে পারবেন।

উচ্চশিক্ষার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য

উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা সফলভাবে সমাপ্ত করার পর মেধা, আগ্রহ ও প্রবণতার ভিত্তিতে পরবর্তী পর্যায়ে সকল শিক্ষাকে উচ্চশিক্ষা বলা হয়ে থাকে। উচ্চশিক্ষার উদ্দেশ্য হবে জ্ঞান সঞ্চারণ ও নতুন জ্ঞানের উদ্ভাবন এবং সেই সঙ্গে দক্ষ জনশক্তি গড়ে তোলা। বিশ্ববিদ্যালয়সমূহে উচ্চশিক্ষার জন্য স্বশাসন ব্যবস্থা অপরিহার্য। বর্তমানে প্রচলিত উচ্চশিক্ষা ব্যবস্থা বাংলাদেশের মত একটি স্বাধীন দেশের প্রয়োজন সম্পূর্ণভাবে মেটাতে সমর্থ নয়। এই পরিপ্রেক্ষিতে উচ্চশিক্ষার সামগ্রিক ব্যবস্থায় পূর্ণবিন্যাস আবশ্যক।

উচ্চশিক্ষার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য নিম্নরূপ: (শিক্ষানীতি-২০১০)

- কার্যকরভাবে বিশ্বমানের শিক্ষাদান, শিক্ষার্থীদের মধ্যে অনুসন্ধিৎসা জাগানো এবং মানবিক গুণাবলি অর্জনে সহায়তা দান।
- অবাধ বুদ্ধিচর্চা, মননশীলতা ও চিন্তার স্বাধীনতা বিকাশে সহায়তাদান করা।
- পাঠদান পদ্ধতিতে সম্ভাব্য সকল ক্ষেত্রে দেশের বাস্তবতাকে উচ্চশিক্ষার সাথে সম্পৃক্ত করা, রাষ্ট্র ও সমাজের সমস্যা সনাক্ত করা ও সমাধান বের করা।
- নিরলস জ্ঞানচর্চা ও নিত্য নতুন বহুমুখী মৌলিক ও প্রায়োগিক গবেষণার ভেতর দিয়ে জ্ঞানের দিগন্তের ক্রমসম্প্রসারণ।
- আধুনিক ও দ্রুত অগ্রসরমান বিশ্বেও মধ্যে কার্যকর পরিচিতি ঘটানো।
- জাতীয় জীবনের সর্বক্ষেত্রে নেতৃত্বদানের উপযোগী বিজ্ঞানমনস্ক, অসাম্প্রদায়িক, উদারনৈতিক, মানবমুখী, প্রগতিশীল ও দূরদর্শী নাগরিক সৃষ্টি।
- জ্ঞান চর্চা, গবেষণা, সৃজনশীলতা ও উদ্ভাবনী হতে জ্ঞানের নতুন নতুন ক্ষেত্র সৃষ্টি।
- মেধার বিকাশ এবং সৃজনশীল নতুন নতুন পথ ও পদ্ধতির উদ্ভাবন।
- জ্ঞান সৃজনশীলতা এবং মানবিক মূল্যবোধ ও দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ নাগরিক সৃষ্টি করা।

উচ্চশিক্ষার কাঠামো

বাংলাদেশে উচ্চশিক্ষার কতকগুলো ধারা রয়েছে। এগুলোর মধ্যে সাধারণ শিক্ষা, প্রকৌশল ও প্রযুক্তি শিক্ষা, চিকিৎসা বিজ্ঞান, কৃষি শিক্ষা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। সাধারণ শিক্ষা স্তরে কাঠামো–

- তিন বছর মেয়াদি স্নাতক (পাস) ডিগ্রী;
- চার বছর মেয়াদি স্নাতক (সম্মান) ডিগ্রী;

- তিন বছর মেয়াদি স্নাতক (পাস) ডিগ্রীদারীদের জন্য দুই বছর মেয়াদি মাস্টার্স ডিগ্রী;
- চার বছর মেয়াদি স্নাতক (সম্মান) ডিগ্রীদারীদের জন্য এক বছর মেয়াদি মাস্টার্স ডিগ্রী;
- দুই বছর মেয়াদি এম.ফিল; এবং
- পিএইচ.ডিসহ বিভিন্ন শিক্ষা কার্যক্রম চালু রয়েছে।

অনুরূপভাবে প্রকৌশল ও প্রযুক্তি শিক্ষা, চিকিৎসা বিজ্ঞান, কৃষিবিজ্ঞানে ৪/৫ বছর মেয়াদি (সম্মান), স্নাতকোত্তর ও এম.পিল ডিগ্রী অর্জনে শিক্ষা কার্যক্রম চালু রয়েছে। বাংলাদেশে মূলত দুই ধরণের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে এসব কার্যক্রমভিত্তিক উচ্চশিক্ষা দেওয়া হয়। এগুলো হচ্ছে–

(ক) বিশ্ববিদ্যালয় (খ) কলেজ। ২০১৫ সালের হিসাব মতে বাংলাদেশে বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর মধ্যে ৩৮টি সরকারি বিশ্ববিদ্যালয় এবং ৮৫টি বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় রয়েছে। জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের অধিভূক্ত ৩১১৯টি কলেজ উচ্চশিক্ষা লাভের সুযোগ রয়েছে। সরকারি ও বে-সরকারীভাবে প্রতিষ্ঠিত মেডিকেল কলেজে চিকিৎসা বিজ্ঞানে অধ্যায়নের সুযোগ রয়েছে।

শিক্ষার্থীর অংশগ্রহণ ও সুযোগ

বিভিন্ন ধরণের উচ্চ মাধ্যমিক পর্যায়ে কৃতকার্য শিক্ষার্থীরা উচ্চশিক্ষা অধ্যয়নের সুযোগ পেয়ে থাকে। শিক্ষার্থীর মেধা ও আগ্রহ অনুযায়ী প্রতিযোগিতা অংশগ্রহণের মাধ্যমে সরকারি ও বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় এবং জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় অধিভূক্ত ও অঙ্গীভূত কলেজ এবং মাদরাসায় উচ্চশিক্ষা অর্জনের সুযোগ রয়েছে।

সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে বৈচিত্র্যময় শিক্ষার সুযোগ রয়েছে। যেমন-

- সাধারণ শিক্ষার বিশ্ববিদ্যালয়– ঢাবি, চবি, রাবি, জাবি।
- কৃষি শিক্ষার বিশ্ববিদ্যালয়– কেবি, বিকেবি।
- চিকিৎসা শিক্ষার বিশ্ববিদ্যালয়– BSMMU, শাহবাগ।
- বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়– বুয়েট, ডুয়েট, কুয়েট, চুয়েট, রুয়েট।
- এফিলিয়েটিং বিশ্ববিদ্যালয়– জাবি, গাজীপুর।
- উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়– বাউবি, গাজীপুর।
- ধর্মীয় শিক্ষার বিশ্ববিদ্যালয়– ইবি, কুষ্টিয়া।

বর্তমানে দেশের যে কোন মেধাবী শিক্ষার্থীর যে কোন সরকারি বিশ্ববিদ্যালয় হতে উচ্চশিক্ষা গ্রহণের অবারিত সুযোগ রয়েছে। তবে প্রতিটি সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হওয়ার জন্য ভর্তি পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করে উত্তীর্ণ হয়ে উচ্চশিক্ষা গ্রহণের যোগ্যতার প্রমাণ দিতে হয়। আমাদের দেশে নতুন প্রতিষ্ঠিতসহ সর্বমোট ৩৮টি সরকারি বিশ্ববিদ্যালয় রয়েছে।

এছাড়াও বৃহত্তম প্রতিটি জেলাতে রয়েছে বিশ্ববিদ্যালয় কলেজ বা স্নাতক কলেজ। কলেজ, চিকিৎসা কলেজ, প্রশিক্ষণ কলেজ, ইন্সটিটিউট, বিজ্ঞান প্রযুক্তি কলেজ, গার্হস্থ্য অর্থনীতি কলেজ, চারুকারু কলেজ, কৃষি কলেজ, কারিগরি ইন্সটিটিউট, ইসলামী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান আছে যা অনেক উন্নয়নশীল দেশে নেই। বিশেষ করে ধর্মভিত্তিক উচ্চশিক্ষা গ্রহণের সুযোগ পৃথিবীর সকল উন্নত দেশগুলোতে অনুপস্থিত রয়েছে। অতএব উচ্চশিক্ষা গ্রহণের জন্য আমাদের দেশ বিশেষভাবে উপযুক্ত বলেই স্বীকার করে নিতে হবে।

বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে উচ্চশিক্ষার সুযোগ

বর্তমানে বাংলাদেশে ৮৫টি বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় চালু রয়েছে। আরো নতুন নতুন বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা এবং সরকারি অনুমোদনের অপেক্ষায় আছে। আমাদের দেশে নব্বই এর দশক হতে উচ্চশিক্ষার সম্প্রসারণ ও গুণগত পরিমান বৃদ্ধির তাগিদে বিপুল শিক্ষার্থীর পরিপ্রেক্ষিতে বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা বিল জাতীয় সংসদে পাশ হয়। যার ফলশ্রুতিতে ১৯৯২ সালে বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় অ্যাক্ট এর আওতায় সারা দেশের আপামর জনসাধারণের উচ্চশিক্ষা চাহিদা পূরণার্থে রাজধানী শহর ঢাকা এবং বাণিজ্যিক রাজধানী চট্টগ্রামে বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়। পরবর্তীতে এসব বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়গুলো ১৯৯৭এবং ২০০৫ সালে সংশোধিত আইন দ্বারা পরিচালিত হয়ে আসছে। পরে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের আমলে ২০০৭ সালে বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় পরিচালনার ক্ষেত্রে নতুন কিছু প্রজ্ঞাপন জারি করা হয়।

এদেশে বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা লগ্ন হতেই উচ্চশিক্ষা গ্রহণের ব্যাপক এবং অবারিত সুযোগ সৃষ্টি করা হয়েছে। বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি কার্যক্রম হতে শুরু করে শ্রেণি কার্যক্রম, পরীক্ষা কার্যক্রম, সনদ প্রদান কার্যক্রম এবং সহশিক্ষাক্রমিক কার্যক্রম সবকিছুই অতি দ্রুততার সাথে নির্ধারিত সময় সীমার মধ্যে সম্পন্ন করা হয়। যার ফলশ্রুতিতে বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্রমাগত উচ্চশিক্ষার চাহিদা বৃদ্ধি পেয়ে চলছে। এছাড়াও বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে উচ্চশিক্ষার কয়েকটি সুযোগ নিচে উল্লেখ করা হল–

- আধুনিক বিশ্ব চাহিদার বিষয়ে উচ্চতর অধ্যয়নওে সুযোগ;
- জব চাহিদার বিষয়ে দ্রুত উচ্চতর শিক্ষা গ্রহণ;
- সিমেস্টার পদ্ধতিতে অধ্যয়ন সুযোগ;
- সান্ধ্যকালীন উচ্চশিক্ষা গ্রহণের অবারিত সুযোগ;
- সাপ্তাহিক হলিডেতে অধ্যয়নের সুযোগ;
- কোনরূপ সেশন জামে না পড়ে নির্ধারিত সময়ে অধ্যয়ন সমাপ্তি;
- স্বনামধন্য অবসার প্রাপ্ত শিক্ষা গুরুর কাছে অধ্যয়ন সুযোগ;
- দ্রুত পরীক্ষার ফল প্রকাশ ও সনদ প্রাপ্তির ব্যবস্থা;
- অধ্যয়ন নিয়ম শৃঙ্খলার নমনীয়তার প্রভাব;
- উন্মুক্ত অধ্যয়ন সুযোগ প্রদান;
- পছন্দময় সাবজেক্টে অধ্যয়নের অবারিত সুযোগ;
- হাতের কাছেই একাধিক উচ্চশিক্ষার প্রতিষ্ঠানের অবস্থান;
- দুর্লভ বিষয়ে অধ্যয়নের সুযোগ রয়েছে বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে।

নিম্নে সরকারি ও বে-সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়, কলেজ ও মাদরাসাসমূহে শিক্ষার্থী ভর্তির সুযোগ সম্পর্কিত তথ্য তুলে ধরা হলো:

সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়

সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়, অধিভূক্ত ও অঙ্গীভূত কলেজ এবং মাদরাসার পরিসংখ্যান: ২০১৫ সালে সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের সংখ্যা ৩৮টি হলেও শিক্ষা কার্যক্রম চালু আছে ৩৭টি বিশ্ববিদ্যালয়ে। সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের অনুষদের সংখ্যা সর্বনিম্ন ২ থেকে ১৩টি এবং বিভাগের সংখ্যা সর্বনিম্ন ২ থেকে ৮০ টি। সাধারণত নতুন বিশ্ববিদ্যালয়ের তুলনায় পুরাতন বিশ্ববিদ্যালয়ে অনুষদ ও বিভাগের সংখ্যা বেশি। এছাড়া শুধু ১৩টি সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে অধিভূক্ত ও অঙ্গীভূক্ত কলেজ/মাদরাসা আছে। বাকি অন্যান্য বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে কোন অধিভূক্ত ও অঙ্গীভূক্ত কলেজ/মাদরাসা নেই। এই ১৩টি বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে অধিভূক্ত ও অঙ্গীভূক্ত কলেজ/মাদরাসার

সংখ্যা মোট ৪,৬৮০টি। তারমধ্যে শুধুমাত্র জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ে অঙ্গীভূত ও অধিভূক্ত কলেজের সংখ্যা ৩,১১৯ টি এবং ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে অঙ্গীভূত ও অধিভূক্ত ১,২৮৫ টি মাদরাসা রয়েছে (২০১৪ সাল পর্যন্ত সকল মাদরাসা ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে ছিল কিন্তু ২০১৫ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে সকল মাদরাসাসমূহ ইসলামি আরবি বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে নিয়ে-এ বিশ্ববিদ্যালয়ের কার্যক্রম শুরু হয়)। অন্যান্য ১১টি বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে অধিভূক্ত ও অঙ্গীভূক্ত কলেজের সংখ্যা মোট ১০৪টি, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে ৪৪টি, বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ে ১টি, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে ২২টি, শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ে ৯টি, খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়ে ১টি, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়ে ৩৩টি, হাজী মোহাম্মদ দানেশ বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ে ১টি, বাংলাদেশ ইউভার্সিটি অব প্রফেশনালস-এ ৫৬টি, বাংলাদেশ টেক্সটাইল বিশ্ববিদ্যালয় ৪টি এবং বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান মেরিটাইম ইউনিভার্সিটির অধীনে ১টি অঙ্গীভূত ও অধিভূত কলেজ রয়েছে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ১০৪টি অধিভূত ও অঙ্গীভূত কলেজের মধ্যে ৭৫টি চিকিৎসা কলেজ, ৫টি প্রকৌশল ও কারিগরি কলেজ, ১টি কারিগরি শিক্ষক প্রশিক্ষণ কলেজ, ৪টি সেবা কলেজ, ৪টি গার্হস্থ্য অর্থনীতি কলেজ এবং ৫টি অন্যান্য কলেজ। বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে ১টি ফিশারিজ কলেজ, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে ২২টি অধিভূক্ত ও অঙ্গীভূক্ত কলেজের মধ্যে চিকিৎসা কলেজ ১৯টি, প্রকৌশল কলেজ ২টি এবং ১টি ডিগ্রী কলেজ রয়েছে। শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের ৯টি অধিভূক্ত ও অঙ্গীভূক্ত কলেজের মধ্যে চিকিৎসা কলেজ ৮টি ও কারিগরি কলেজ ১টি। খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে ১টি সরকারি অনার্স কলেজ, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে ৩৩টি চিকিৎসা কলেজ, হাজী মোহাম্মদ দানেশ বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ে ১টি বিজ্ঞান কলেজ ও বাংলাদেশ ইউনিভার্সিটি অব প্রফেশনালস-এ ৫৬টি অধিভূক্ত ও অঙ্গীভূত কলেজের মধ্যে সামরিক শিক্ষা কলেজ ৪৪টি এবং চিকিৎসা কলেজ ৯টি, প্রকৌশল কলেজ ২টি ও সাধারণ ১টি কলেজ রয়েছে। বাংলাদেশ টেক্সটাইল বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে ৪টি কারিগরি কলেজ এবং বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান মেরিটাইম ইউনিভার্সিটির অধীনে ১টি মেরিন একাডেমি রয়েছে। তাছাড়া বর্তমানে ঢাকা শহরের ৮টি স্নাতক ও স্নাতকোত্তর ডিগ্রী প্রদানকারী কলেজ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে ন্যস্ত করা হয়েছে এবং একাডেমিক কার্যক্রম পরিচালনা করছে।

২০১৪ ও ২০১৫ সালের তুলনামূলক আলোচনা করলে দেখা যায় যে, ২০১৫ সনে ২টি সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের কার্যক্রম বেড়েছে, অনুষদ ১৮২টির স্থলে ১৯৭টি, বিভাগ ৮৮২ টির স্থলে হয়েছে ৯৫২টি, ইন্সটিটিউট বেড়ে হয়েছে ৫৪টি এবং অধিভূক্ত ও অঙ্গীভূক্ত কলেজ/মাদরাসার সংখ্যা ২০১৪ ছিল ৩,৭৮৫টি ২০১৫ সনে বেড়ে হয়েছে ৪,৬৮০টি অর্থাৎ এ বছর বেড়েছে ৮৯৫টি।

সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের ভর্তিকৃত শিক্ষার্থী ও প্রথম বর্ষের আসন সংখ্যাঃ জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় ও উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয় এবং ইসলামি আরবি বিশ্ববিদ্যালয় ব্যতীত ৩৪টি সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের স্নাতক পাস/স্নাতক সম্মান পর্যায়ে প্রথম বর্ষের আসন সংখ্যা ৪৩,২১৪টি; তন্মধ্যে ভর্তিকৃত শিক্ষার্থীর সংখ্যা ৪৩,৮৬৭ জন, মাস্টার্স পর্যায়ে ২৭,৩২১ টি আসনে ভর্তিকৃত শিক্ষার্থী ছিল ২৬,১৯৪ জন। স্নাতক পাস/স্নাতক সম্মান, মাস্টার্স, এমফিল, পিএইচডি ডিপ্লোমা ও সার্টিফিকেটসহ ৭৪,৫৪০ টি; তন্মধ্যে ভর্তিকৃত শিক্ষার্থীর সংখ্যা ৭৪,০৬৬ জন। কয়েকটি বিশ্ববিদ্যালয়ে আসন সংখ্যার অতিরিক্ত ভর্তি করা হয়েছে ১,১৯৫ জন। অন্যদিকে কয়েকটি বিশ্ববিদ্যালয়ে ১,৬২৯ টি আসন শূন্য ছিল। জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের স্নাতক পাস পর্যায়ে প্রথম বর্ষের আসন সংখ্যা নির্দিষ্ট নেই বিধায় ভর্তিকৃত ৩,৪০,৮৬৬ জনকে আসন সংখ্যা ধরে স্নাতক সম্মান পর্যায়ে আসন সংখ্যা ৩,২০,৯৫৩ জন সহ স্নাতক সম্মান পর্যায়ে মোট আসন সংখ্যা ৬,৬১,৮১৯টি এবং ভর্তি ছিল ৬,১৬,৭৭৪ জন। জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের স্নাতক পাস/স্নাতক সম্মান, মাস্টার্স, এম.ফিল, পিএইচডি, ডিপ্লোমা ও সার্টিফিকেটসহ আসন সংখ্যা ৮,৬৬,৩৭৪ টি; তন্মধ্যে শিক্ষার্থীর সংখ্যা ৮,২১,৩২৯ জন, আসন শূন্য ছিল ৪৫,০৪৫টি। উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের স্নাতক সম্মান

পর্যায়ে প্রথম বর্ষের আসন সংখ্যা ৭৮৭ জন, স্নাতক পাস এবং মাস্টার্স পর্যায়ে ২,৪৪২ টি সহ মোট আসন সংখ্যা ৪১,৯১৫টি; তন্মধ্যে ভর্তিকৃত শিক্ষার্থীর সংখ্যা ৪১,৫১৪ জন আসন শূন্য ছিল ৪০১টি।

২০১৫ সালে এইচএসসি পরীক্ষায় জিপিএ- ৫ প্রাপ্ত শিক্ষার্থীর সংখ্যা ছিল ৪২,৮৯৪ জন। অন্যদিকে ৩৪টি সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে (জাতীয়, উন্মুক্ত ইসলামি আরবি ও অধিভূক্ত ও অঙ্গীভূত ব্যতীত) আসন সংখ্যা ৪৩,২১৪ টি সহ সরকারি মেডিকেল ও ডেন্টাল কলেজের ৩,৬৯৪ টি আসনসহ মোট প্রায় ৪৬,৯০৮টি আসন ছিল, যা কিনা ২০১৫ সনে জিপিএ- ৫ প্রাপ্ত শিক্ষার্থীর তুলনায় অধিক। জাতীয়, উন্মুক্ত, ইসলামি আরবিসহ সকল অধিভূক্ত ও অঙ্গীভূত কলেজ/মাদরাসায় স্নাতক পাস/স্নাতক সম্মান পর্যায়ে ১ম বর্ষে ভর্তির আসন সংখ্যা বিবেচনা করলে দেখা যায় আলোচ্য বছর এইচএসসি/সমমান পরীক্ষায় উত্তীর্ণ প্রায় বেশির ভাগ শিক্ষার্থী সরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে উচ্চশিক্ষা গ্রহণ করতে পারে। অর্থাৎ বর্তমান সরকার প্রায় সকল এইচএসসি/সমমান পাশকৃত শিক্ষার্থীর উচ্চশিক্ষা অর্জনের সুযোগ নিশ্চিত করেছে।

সরকারি বিশ্ববিদ্যালয় এবং অধিভূক্ত ও অঙ্গীভূক্ত কলেজ এবং মাদরাসার মোট শিক্ষার্থী পরিসংখ্যান: ২০১৫ সালে সবকটি সরকারি বিশ্ববিদ্যালয় এবং এদের অধীন অধিভূক্ত ও অঙ্গীভূক্ত কলেজ/মাদরাসায় মোট শিক্ষার্থী সংখ্যা ৩২,০৬,৪৩৫ জন; তন্মধ্যে ছাত্রী সংখ্যা ১৩,২৭,১৪৭ জন। অন্যদিকে ২০১৪ সালে সর্বমোট শিক্ষার্থী ছিল ২৮,৪৯,৮৬৫ এবং তন্মধ্যে ছাত্রী সংখ্যা ছিল ১২,৩৮,৮৯২ জন। সর্বমোট অধ্যয়নরত শিক্ষার্থী পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে, ২০১৫ সালে মোট শিক্ষার্থী বেড়েছে ৩,৫৬,৫৭০ জন তন্মধ্যে ছাত্রী সংখ্যা বেড়েছে ৮৮,২৫৫ জন।

৩৪টি বিশ্ববিদ্যালয়ের (অধিভূক্ত ও অঙ্গীভূক্ত কলেজের শিক্ষার্থী ব্যতীত) মোট শিক্ষার্থী সংখ্যা ২,৪৪,৩৬৩ জন এবং তন্মধ্যে ছাত্রী সংখ্যা ছিল ৭৮,৩৭৬ জন। জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ে নিজস্ব কোন শিক্ষার্থী না থাকলেও এর অধীনে ৩,১১৯টি অধিভূক্ত ও অঙ্গীভূক্ত কলেজে শিক্ষার্থী সংখ্যা ২০,৭৩,০৬৯ জন; জন্মধ্যে ছাত্রী সংখ্যা ৯,২৬,৫৬৮ জন; উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থী সংখ্যা ২,০৭,৮২৯ জন; তন্মধ্যে ছাত্রী সংখ্যা ৮১,০৯৬ জন। ইসলামি আরবি বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে ১২৮৫ টি মাদরাসার শিক্ষার্থী সংখ্যা ৫,৯৮,০৩১ জন তন্মধ্যে ছাত্রী সংখ্যা ১,৯৭,৩৮৫ জন। অন্যান্য ১১টি বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে অধিভূক্ত ও অঙ্গীভূক্ত কলেজের শিক্ষার্থী মোট সংখ্যা ৮৩,১৪৩ জন এর মধ্যে ছাত্রী ছিল ৪৩,৭২২ জন। সকল সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়নরত শিক্ষার্থী পরিসংখ্যান পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে, জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে অধিভূক্ত ও অঙ্গীভূক্ত কলেজসমূহে প্রায় ৬৪.৭ ভাগ শিক্ষার্থী, উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রায় ৬.৫ ভাগ এবং ইসলামি আরবি বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে মাদরাসায় প্রায় ১৮.৬ ভাগসহ মোট প্রায় ৮৯.৮ ভাগ শিক্ষার্থী এই তিনটি বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ালেখা করছে। অবশিষ্ট শিক্ষার্থীর প্রায় ৭.৬ ভাগ ৩৪টি বিশ্ববিদ্যালয়ে এবং ২.৬ ভাগ অন্যান্য ১১টি বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে অধিভূক্ত ও অঙ্গীভূক্ত কলেজসমূহ পড়ালেখা করছে।

বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়

শিক্ষার্থী: ২০১৫ সালে ৮৫টি (২০১৫ সালে অনুমোদিত বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের সংখ্যা ৮৫টি হলেও ৩টি বিশ্ববিদ্যালয়ের একাডেমিক কার্যক্রম শুরু হয়নি) বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে সর্বমোট শিক্ষার্থী ছিল ৩,৫০,১৩০ জন; তন্মধ্যে ছাত্রী ৯৪,৩৮০ জন এবং বিদেশি শিক্ষার্থী ১,৫৪৮ জন। উল্লেখ্য যে, ২০১৪ সালে ৭৫টি (২০১৪ সালে অনুমোদিত বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের সংখ্যা ৮০টি হলেও ৫টি বিশ্ববিদ্যালয়ের একাডেমিক কার্যক্রম শুরু হয়নি) বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে সর্বমোট শিক্ষার্থী ছিল ৩,৩০,৭৩০ জন; তন্মধ্যে ছাত্রী ৮৭,৫৭৯ জন এবং বিদেশি শিক্ষার্থী ১,৬৪৩ জন।

বিভাগ অনুযায়ী শিক্ষার্থীর পরিসংখ্যান: ২০১৫ সালে দেশের ৮৫টি (২০১৫ সালে অনুমোদিত বিশ্ববিদ্যালয়ের সংখ্যা ৮৫টি হলেও ৩টি বিশ্ববিদ্যালয়ের একাডেমিক কার্যক্রম শুরু হয়নি) বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে বিজ্ঞানের

বিভিন্ন বিষয়সহ চিকিৎসা, প্রকৌশল ও কৃষি বিজ্ঞানে শিক্ষার্থী ছিল ১,৩০,২৮৪ জন। এছাড়া ব্যবসায় প্রশাসনে ১,২৬,৭৫৪ জন এবং ফার্মেসীতে ৯,৭৩৩ জন। অপরদিকে কলা, সামাজিক বিজ্ঞান (অর্থনীতি সহ), শিক্ষা ও আইন বিষয়ে সম্মিলিতভাবে শিক্ষার্থী ছিল ৭৭,১৯২ জন এবং সার্টিফিকেট কোর্স, ডিপ্লোমা ও পোস্ট গ্রাজুয়েট ডিপ্লোমা কোর্সে ৬,১৬৭ জন।

অনুষদভিত্তিক শিক্ষার্থীর শতকরা হিসাবঃ ২০১৫ সালে সর্বমোট শিক্ষার্থীর শতকরা হার– ব্যবসায় প্রশাসনে প্রায় ৩৬.২০, বিজ্ঞান, চিকিৎসা, প্রকৌশল ও কৃষি বিজ্ঞান অনুষদে প্রায় ৩৭.২১, ফার্মেসীতে ২.৭৮ এবং কলা, সামাজিক বিজ্ঞান, শিক্ষা ও আইন বিষয়ে শতকরা প্রায় ২২.০৫ ভাগ শিক্ষার্থী অধ্যয়নরত ছিল। এছাড়া সার্টিফিকেট কোর্স, ডিপ্লোমা ও পোষ্ট গ্রাজুয়েট ডিপ্লোমা কোর্সে অধ্যয়নরত ছিল ১.৭৬ ভাগ।

[উৎস: বাংলাদেশ বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশনের বার্ষিক প্রতিবেদন- ২০১৫, প্রকাশকাল- সেপ্টেম্বর, ২০১৬]

পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ৪.১

ক. বহু নির্বাচনী প্রশ্ন

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন।

১. জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ে অধিভূক্তি কলেজের সংখ্যা কত?
   ক. ৩১০০টি
   খ. ৩১১২টি
   গ. ৩১১৯টি
   ঘ. ৩১২৬টি

২. ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে অধিভূক্তি চিকিৎসা কলেজের সংখ্যা কত?
   ক. ৭০টি
   খ. ৭৫টি
   গ. ৮০টি
   ঘ. ৮৫টি

৩. বাংলাদেশের বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় সংখ্যা কত?
   ক. ৩৫টি
   খ. ৩৬টি
   গ. ৩৭টি
   ঘ. ৩৮টি

উত্তরমালা: ১. গ, ২. খ, ৩. ঘ

খ. সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন

১. উচ্চশিক্ষা বলতে কী বুঝায়?
২. বাংলাদেশে উচ্চশিক্ষার স্তরগুলো উল্লেখ করুন।

গ. রচনামূলক প্রশ্ন

১. উচ্চশিক্ষার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য বর্ণনা করুন।
২. উচ্চশিক্ষায় শিক্ষার্থীর অংশগ্রহণ ও সুযোগ কতটুকু সফলতা আসতে পারে– সে সম্পর্কে আপনার মতামত দিন।

পাঠ ৪.২: উচ্চশিক্ষায় প্রকারভেদ: বিশ্ববিদ্যালয়, কলেজ ও অন্যান্য প্রতিষ্ঠানসমূহ

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি–

- বিশ্ববিদ্যালয় ও কলেজের প্রকারভেদ উল্লেখ করতে পারবেন।
- সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে উচ্চশিক্ষার বর্তমান অবস্থা বিশ্লেষণ করতে পারবেন।
- বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের বর্তমান অবস্থা বর্ণনা করতে পারবেন।

বাংলাদেশের বিশ্ববিদ্যালয় তিনভাগে বিভক্ত

১. সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়;
২. বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়;
৩. আন্তর্জাতিক বিশ্ববিদ্যালয়।

বর্তমানে সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে ৪৪টিতে সাধারণ, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি, কৃষি ভেটেনারি, প্রফেশনাল, টেক্সটাইল ও মেডিকেল এ উচ্চশিক্ষা গ্রহণের সুযোগ রয়েছে।

বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে ৮৫টির অধিক এতে সাধারণ বিষয় সহ বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি সম্পর্কিত নানান বিষয়ে অধ্যয়নের সুযোগ রয়েছে। তাছাড়া বাংলাদেশে দুটি আন্তর্জাতিক বিশ্ববিদ্যালয়ে সাধারণ ও প্রযুক্তি বিষয়ে অধ্যয়নের সুযোগ রয়েছে।

বাংলাদেশে কলেজ দুই ভাগে বিভক্তি

১. সরকারিভাবে প্রতিষ্ঠিত ডিগ্রী পর্যায়ে কলেজ;
২. বে-সরকারিভাবে প্রতিষ্ঠিত ডিগ্রী পর্যায়ে কলেজ এবং মাদরাসা।

উভয় প্রকার কলেজ ও মাদরাসা জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ে অধিভূক্ত হিসাবে উচ্চশিক্ষা গ্রহণের সুযোগ রয়েছে। এফিলিয়েটিং বিশ্ববিদ্যালয় হিসেবে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় বাংলাদেশে উচ্চশিক্ষার সিংহভাগ ভূমিকা পালন করে। সরকারি ও বে-সরকারি কলেজসহ প্রায় ৩১১৯টি অঙ্গীভূক্ত ও অধিভূক্ত কলেজ রয়েছে। এরমধ্যে ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠান কর্তৃক পরিচালিত কলেজ ও রয়েছে। তাছাড়া ইসলামী আরবি বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে অঙ্গীভূক্ত ও অধিভূক্ত ১২৮৫টি মাদরাসার উচ্চশিক্ষার সুযোগ রয়েছে। নিচে সরকারি ও বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে বর্তমান অবস্থা আলোচনা করা হলো।

সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে উচ্চশিক্ষার বর্তমান অবস্থা

ব্রিটিশ ভারতে ইংল্যান্ডের লিডস বিশ্ববিদ্যালয়ের সুযোগ্য উপাচার্য ড. মাইকেল স্যাডলারকে সভাপতি করে গঠিত স্যাডলার কমিশনের সুপারিশ অনুযায়ী (১৯১৭-১৯) সর্বপ্রথম আমাদের এ বাংলাদেশ অংশের ঢাকায় ১৯২১ সালে উচ্চশিক্ষার সরকারি প্রতিষ্ঠান ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়। পরবর্তীতে বিভিন্ন অবস্থার প্রেক্ষাপটে বিভিন্নভাবে বিভিন্ন দাবী ও চাহিদার পরিপ্রেক্ষিতে আমাদের দেশে উচ্চশিক্ষার বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। এখনও বিভিন্ন ক্যাটাগরির বিশেষায়িত সরকারি বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ অব্যাহত রয়েছে। বর্তমানে এ দেশে ৩৮টি সরকারি বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। অন্যদিকে আগস্ট ১৯৯২ সালে বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় অধ্যাদেশ জারির

পর হতে ক্রমান্বয়ে বেসরকারি ব্যবস্থাপনায় বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। এখনও আরো কয়েকটি বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ আবেদন সরকারের হাতে জমা আছে। যাদের অনুমোদন প্রদান হলেই আরো নতুন বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হবে। বর্তমানে এদেশে ৮৫টি বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় রয়েছে। বাংলাদেশের সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চশিক্ষার বর্তমান অবস্থা বর্ণনার বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ কয়েকটি দিক নিচে উল্লেখ করা হলো–

ভর্তি প্রক্রিয়া: এদেশের সকল সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে উচ্চশিক্ষা গ্রহণের জন্য নূন্যতম প্রাথমিক যোগ্যতা ধরা হয়ে উচ্চ মাধ্যমিক বা H.S.C এবং সমমানের সনদ। যারা উক্ত সনদ অর্জন করতে পেরেছে তারা নির্ধারিত প্রক্রিয়ায় ভর্তি পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করে বিশ্ববিদ্যালয়ের নির্ধারিত যোগ্যতা সীমা অর্জন করতে পারলেই উচ্চশিক্ষা গ্রহণের সুযোগ পায়। এটি তীব্র প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষা।

একাডেমিক কার্যক্রম: প্রতিটি সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের একাডেমিক কার্যক্রম বিভিন্ন বিভাগ, ইন্সটিটিউট বা কলেজে বিভক্ত। একাডেমিক কার্যক্রম নিয়ন্ত্রণ ও সঠিক ব্যবস্থাপনায় সংশ্লিষ্ট শিক্ষকবৃন্দ নিবেদিত আছেন। উচ্চশিক্ষার বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে যে সব একাডেমিক শিক্ষা কার্যক্রম চালু রয়েছে তার মাঝে নিচেরগুলো উল্লেখযোগ্য–

- চার বছর মেয়াদী স্নাতক ডিগ্রি কার্যক্রম।
- চার বছর মেয়াদী স্নাতক (সম্মান) শিক্ষা কার্যক্রম।
- এম.ফিল (M.Phil) প্রোগাম।
- পিএইচ.ডি (Ph.D) এবং গবেষণা কার্যক্রম।

সাংস্কৃতিক ও বিনোদন কার্যক্রম: প্রতিটি সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে লেখাপড়ার পাশাপাশি শিক্ষা সাংস্কৃতিক এবং বিনোদনমূলক কার্যক্রমের চর্চা হয়ে থাকে। জাতীয় এবং প্রথাগত সাংস্কৃতিক চর্চা আমাদের মৌলিক শিক্ষা কার্যক্রমভুক্ত। বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন বিভাগে বা হল ভিত্তিক এ সাংস্কৃতিক কার্যক্রমের প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়। আর বিনোদনের জন্যও অবারিত সুযোগ অব্যাহত রয়েছে।

গবেষণামূলক কার্যক্রম: সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চতর পর্যায়ের শিক্ষা ক্ষেত্রে গবেষণামূলক কার্যক্রমের অবারিত সুযোগ রয়েছে। প্রত্যেক বিভাগের/প্রত্যেক বিষয়ের মাস্টার্স পর্বের শিক্ষার্থীরা থিসিস এবং নন থিসিস এ দু'ভাগে বিভক্ত হয়ে অধ্যয়ন করে থাকে। থিসিস গ্রুপের শিক্ষার্থীরা নিজেদেরকে নির্ধারিত বিষয়ে গবেষণা কাজে ব্রত রেখে উদ্ভাবিত ফলাফলকে থিসিস পেপারের মাধ্যমে প্রকাশ করে থাকে। এছাড়া এম.ফিল এবং পিএইচ.ডি গবেষণা করারও সুযোগ সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে অবারিত এবং উন্মুক্ত রয়েছে।

প্রকাশনা কার্যক্রম: প্রতিটি সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে বিভিন্ন সময় বিভিন্নভাবে কোন না কোন বিষয়ে প্রকাশনার কাজ চালিয়ে যাওয়া হয়। বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন গবেষণা তথ্যাদি প্রকাশনার মাধ্যমে প্রচার করা হয়। এ ছাড়া নিয়মিত জার্নাল, পুস্তিকা, গ্রন্থাদি, ম্যাগাজিন, প্রসফেক্টাস ইত্যাদি রচনা, সম্পাদনা, মুদ্রণ করে প্রকাশ করা হয়। বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা সাংস্কৃতিক বিষয়ক কার্যাবলি অন্তর্ভূক্ত থাকে। যা বাইরের জনগণ পড়ার সুযোগ পায়।

প্রশাসনিক কার্যক্রম: সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর প্রশাসনিক ব্যবস্থাপনার কার্যক্রমে বিভিন্ন সংস্থা, সংগঠন এবং সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের সংশ্লিষ্টতা রয়েছে। এক্ষেত্রে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য হল–

- শিক্ষা মন্ত্রণালয়;
- চ্যান্সেলরের প্রশাসনিক কার্যক্রম;
- সিনেট এর ব্যবস্থাপনা;
- ভাইস চ্যান্সেলরের প্রশাসনিক ব্যবস্থাপনা;

- একাডেমিক কাউন্সিলের কার্যক্রম;
- ডীন এর কার্যক্রম;
- প্রক্টরের কার্যক্রম;
- প্রভোস্টের কার্যক্রম;
- বিভাগীয় প্রশাসনিক ব্যবস্থাপনা।

সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের অনুষদ, বিভাগ, ইন্সটিটিউট এবং এদের অধিভূক্ত ও অঙ্গীভূত কলেজ/মাদরাসার পরিসংখ্যান (ইউজিসি প্রতিবেদন, ২০১৫)

ক্র:	বিশ্ববিদ্যালয়	অনুষদ সংখ্যা	বিভাগ সংখ্যা	ইন্সটিটিউট সংখ্যা	অধিভূক্ত ও অঙ্গীভূত কলেজ/মাদরাসা সংখ্যা
১	ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়	১৩	৮০	১১	১০৪
২	রাজশাহী	১০	৫৭	৬	৪৪
৩	বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়	৬	৪৩	৩	১
৪	বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়	৫	১৮	৫	০
৫	চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়	৯	৪৩	৭	২২
৬	জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়	৬	৩৪	৩	০
৭	ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়	৫	২৫	১	০
৮	শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়	৭	২৬	১	৯
৯	খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়	৫	২৬	১	১
১০	জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়*	০	০	০	৩১১৯
১১	বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়*	৬	৩২	০	০
১২	বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়	৭	৪৫	০	৩৩
১৩	বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়	৫	৩৫	০	০
১৪	হাজী মোহাম্মদ দানেশ বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়	৮	৪২	১	১
১৫	মাওলানা ভাসানী বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়	৫	১৫	০	০
১৬	পটুয়াখালী বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়	৭	৫৩	০	০
১৭	শেরেবাংলা কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়	৩	৩০	১	০
১৮	চট্টগ্রাম প্রকৌশল ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়	৫	১৫	৩	০
১৯	রাজশাহী প্রকৌশল ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়	৪	১৪	০	০
২০	খুলনা প্রকৌশল ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়	৩	১৬	২	০
২১	ঢাকা প্রকৌশল ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়	৩	১১	০	০
২২	নোয়াখালী বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়	৩	১৭	২	০
২৩	জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়	৬	৩৩	১	০
২৪	কুমিল্লা বিশ্ববিদ্যালয়	৬	১৯	০	০
২৫	জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলাম	৪	১৬	০	০

	বিশ্ববিদ্যালয়				
২৬	চট্টগ্রাম ভেটেরিনারি ও এনিম্যাল সাইন্সে বিশ্ব:	৩	১৮	৩	০
২৭	সিলেট কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়	৬	৪৭	০	০
২৮	যশোর বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়	৬	১৮	০	০
২৯	বাংলাদেশ ইউনিভার্সিটি অব প্রফেশনালস	৮	২৩	০	৫৬
৩০	বেগম রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয়- রংপুর	৬	২১	১	০
৩১	পাবনা বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়	৫	১৯	১	০
৩২	বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়	৭	২০	১	০
৩৩	বাংলাদেশ টেক্সটাইল বিশ্ববিদ্যালয়	৫	১৭	০	৪
৩৪	বরিশাল বিশ্ববিদ্যালয়	৬	২০	০	০
৩৫	রাঙ্গামাটি বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়	২	২	০	০
৩৬	বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান মেরিটাইম বিশ্ববিদ্যালয়	২	২	০	১
৩৭	ইসলামি আরবি বিশ্ববিদ্যালয়*	০	০	০	১২৮৫
	সর্বমোট=	**১৯৭**	**৯৫২**	**৫৪**	**৪৬৮০**

*জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের ৩,১১৯টি কলেজে ৫টি একাডেমিক ইউনিটের মাধ্যমে শিক্ষা কার্যক্রম পরিচালিত হয়। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়ে ৪৫টি বিভাগে ৭৫টি কোর্স এবং বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ে ৬টি স্কুলের অধীনে ৩২টি প্রোগ্রাম চালু আছে। বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ে ১২টি আঞ্চলিক কেন্দ্র, ৮০টি উপ-আঞ্চলিক কেন্দ্র ও ১,৪৭৫টি স্টাডি সেন্টার আছে এবং ইসলামি আরবি বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে ১,২৮৫টি মাদরাসা রয়েছে।

সারা দেশব্যাপী সরকারি ব্যবস্থাপনায় উচ্চশিক্ষা গ্রহণের জন্য শিক্ষার্থীর ব্যাপক চাহিদা থাকায় সরকার আরো কতকগুলো নতুন বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের উদ্যোগ নিয়েছে। অন্যদিকে ভিন্ন একটি প্রকল্পের মাধ্যমে এদেশের বৃহত্তম জেলা শহরে অবস্থিত বিশ্ববিদ্যালয় কলেজগুলোকে সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে উত্তীর্ণ করার ব্যবস্থা গ্রহণ করা হচ্ছে।

বেসরকারী বিশ্ববিদ্যালয়ে উচ্চশিক্ষার বর্তমান অবস্থা

আগস্ট ১৯৯২ বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় অধ্যাদেশ জারির পর হতে আমাদের দেশে প্রতি বছরই নতুন নতুন বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হচ্ছে। বর্তমানে আমাদের দেশে ৮৫টি বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় চালু রয়েছে। আরো কিছু বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার অপেক্ষায় আছে। BUGC এবং সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের অনুমোদন ও পৃষ্ঠপোষকতা পেলেই তাদের প্রতিষ্ঠানসহ একাডেমিক কার্যক্রম চালাবে। কারন এ দেশে প্রতিনিয়ত উচ্চশিক্ষা গ্রহণের চাহিদা বাড়ছে এবং শিক্ষার্থীর উচ্চশিক্ষা গ্রহণের জন্য বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি চাপ অব্যাহতভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে।

বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার অধ্যাদেশ জারির পর হতে ২০০০ সালের মধ্যে শুধু ঢাকাতেই ২৭টি বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। এ পর্যন্ত প্রতিষ্ঠিত বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর মাঝে ৯৫% ভাগ শহর কেন্দ্রিক প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। বর্তমানে বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়গুলো তাদের নিজস্ব আঙ্গিকে শিক্ষার্থীর চাহিদাভিত্তিক বিভিন্ন অনুষদ, বিভাগ এবং ইন্সটিটিউট খুলেছে। বাংলাদেশে উচ্চশিক্ষায় অধ্যয়নকৃত মোট শিক্ষার্থীর ৪৩% বেসরকারি

বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়ন করছে। বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে উচ্চশিক্ষা কার্যক্রমের বর্তমান অবস্থার কতিপয় দিক নিচে বর্ণনা করা হল–

- **ভর্তি কার্যক্রম:** প্রধানত সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে যে সব শিক্ষার্থী ভর্তি হতে পারে না তারাই বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হয়। এখানে ভর্তি প্রতিযোগিতা কিছুটা শিথিল। যোগ্যতার মাপ কাঠিতে মেধাবী এবং অপেক্ষাকৃত কম মেধাবী উভয় ধরনের শিক্ষার্থীর বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়ন করে। বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষার্থীদের ভর্তি ফিসহ টিউশন ফি এবং অন্যান্য ফি অত্যন্ত বেশি। কারণ শিক্ষার্থীর নিকট হতে আদায়কৃত অর্থ দ্বারাই বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় পরিচালিত হয়।
- **শিক্ষা কার্যক্রমের মডেল:** শিক্ষা কার্যক্রম পরিচালনায় বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়গুলো সাধারণত আমেরিকান বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা মডেলকে অনুসরণ করে থাকে, কতিপয় বিশ্ববিদ্যালয় ব্রিটিশ শিক্ষা মডেল অনুসরণ করে। আর সকল বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় ৪ বছরের স্নাতক (সম্মান) এবং ২ বছরের মাস্টার্স কোর্স পরিচালনা করে থাকে। প্রতিটি কোর্স পরিচালনায় ক্রেডিট এবং সেমিস্টার ব্যবস্থার অনুসরণ করে। প্রতি সিমেস্টার অনুযায়ী টিউশন ফি আদায় কর হয়। যার দ্বারা বিশ্ববিদ্যালয় ব্যয় নির্বাহ হয়।
- **নিজস্ব ক্যাম্পাস ব্যবস্থা:** এদেশের অধিকাংশ বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের নিজস্ব কোন ক্যাম্পাস নেই। তাদেরকে ভাড়া করা বাড়িতে অবস্থান করে উচ্চশিক্ষা কার্যক্রম পরিচালনা করে আসতে হয়েছে। আর প্রায় সবকটি বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের অবস্থান শুধু ঢাকাতে। অন্যান্য বিভাগীয় শহরে তাদের শাখা প্রতিষ্ঠিত করেছে। এভাবে ভাড়া করা বাড়িতে অবস্থান করে উচ্চশিক্ষা কার্যক্রম অব্যাহত রাখা অত্যন্ত জটিল সমস্যাপূর্ণ। এ অবস্থা হতে উত্তরণের ব্যবস্থা করা আবশ্যক।
- **সাংস্কৃতিক ও বিনোদন চর্চার অবস্থা:** বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে ব্যাপক পরিসরে না হলেও অভ্যন্তরীণ পর্যায়ে সাংস্কৃতিক এবং বিভিন্ন ধরনের বিনোদন কার্যক্রম অব্যাহত রয়েছে। অভ্যন্তরীণ ক্রীড়া প্রতিযোগিতা, নাচ, গান, আবৃত্তি, বিতর্ক প্রতিযোগিতা, শিক্ষা সফর, বনভোজন ইত্যাদি কার্যক্রম চালু আছে। তবে তা সামর্থ অনুসারে আরো বেশি সম্প্রসারিত করা উচিৎ। শিক্ষা সফরের নামে এক দিনের কোন ভ্রমন কিংবা নৌবিহার করা যুক্তিসঙ্গত নয়। শিক্ষা সফর শিক্ষার অংশ। কাজেই একে ব্যাপক পরিসরে শিক্ষা সংশ্লিষ্ট করে সম্পন্ন করা সমীচীন।
- **সীমিত গবেষণা কার্যক্রম:** বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চশিক্ষার গবেষণা কার্যক্রম অত্যন্ত সীমিত। যদিও তারা উচ্চশিক্ষার উচ্চতর গ্রেডের সনদ যোগান দিয়ে চলছে তথাপি তাদের সকল শিক্ষা কার্যক্রম কাঙ্খিত পর্যায়ের না। তাদের প্রয়োজনীয় গবেষণা উপকরণ, গবেষণাগার, দক্ষ অভিজ্ঞ ও প্রজ্ঞাধারী শিক্ষক না থাকায় থিসিস বা গবেষণার কার্যক্রম পরিচালিত করা সম্ভব হয়ে উঠছে না। এক্ষেত্রে তাদের যথেষ্ট অপূর্ণাঙ্গতা রয়েছে বলা চলে।
- **পরিবহণ ও আবাসন ব্যবস্থা:** প্রতিটি বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের নিজস্ব কোন পরিবহণ এবং আবাসন ব্যবস্থা নেই। ভাড়া করা বাড়িতে বিশ্ববিদ্যালয় চলে। শিক্ষার্থীরা নিজ দায়িত্বে আবাসন ব্যবস্থা করে নেয়। সাধারণ পরিবহণে চড়ে শিক্ষার্থীরা উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানে যাতায়াত করে। বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের সার্বিক অবস্থার বিবেচনা এটিও তাদের অপূর্ণাঙ্গতার নজীর হিসেবে বিবেচিত হতে পারে।
- **একাডেমিক কার্যক্রম:** এদেশের কতিপয় বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষাক্রম, পাঠ্যসূচি, জনবল কাঠামো এবং শিক্ষার যাবতীয় একাডেমিক কার্যক্রম বিশ্বের আধুনিক দেশের বিশ্ববিদ্যালয়ের সমতুল্য। যার ফলে তারা বাংলাদেশে অবস্থান করেও পৃথিবীর উন্নত ইউরোপের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের সাথে ক্রেডিট ট্রান্সফার করতে পারে। আমেরিকা এবং ইউরোপের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের সাথে সমমানের একাডেমিক সম্পর্ক বজায় রেখেছে। বর্তমানে বিদেশি ব্যাংক, বীমা প্রতিষ্ঠান এবং মাল্টিমিলিয়নার জয়েন্ট ভেঞ্চার কোম্পানী নর্থ সাউথ, ইন্ডিপেডেন্ট এবং ইস্টওয়েস্ট বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রাজ্যুয়েটদের চাকরি দানে বেশি আগ্রহ প্রকাশ করছে।

- **শিক্ষক ও জনবল কাঠামো:** আমাদের বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়গুলো অধিকাংশ ক্ষেত্রেই খন্ডকালীন শিক্ষক দিয়ে শিক্ষা কার্যক্রম পরিচালিত করছে। যারা সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক তাদের যোগ্যতা মোটামুটি প্রতিষ্ঠিত। তবে অধিকাংশ বিশ্ববিদ্যালয় তাদের নিজস্ব শিক্ষক স্থায়ীভাবে নিয়োগ দেয় না। এতে শিক্ষক স্বল্পতা থেকেই যায়। অন্যদিকে নিজেদের আত্মীয় স্বজন, হিতৈষী এবং অনৈতিকতার প্রভাবে অযোগ্য লোক নিয়োগ দিয়ে মাথাভারি অযোগ্য জনবল তৈরি করেছে। এতে করে উচ্চশিক্ষার যাবতীয় কার্যাবলি সঠিকভাবে সম্পন্ন করা সম্ভব হয়ে উঠছে না।
- **ভৌত অবকাঠামো অবস্থা:** অধিকাংশ বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের নিজস্ব ক্যাম্পাস ভবন বলতে কিছুই নেই। প্রায় সকলেই ভাড়া বাড়িতে বিশ্ববিদ্যালয় চালায়। আবাসন ব্যবস্থা নেই। একাডেমিক কার্যক্রমের জন্য পর্যাপ্ত শ্রেণিকক্ষ, গবেষণাগার, লাইব্রেরী, ক্যান্টিন, অফিস, বিনোদন স্পেস নেই। প্রতিটি বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের ভৌত অবকাঠামোগত অবস্থা অত্যন্ত নাজুক পর্যায়ের। প্রতিটিরই ধারণ ক্ষমতার অতিরিক্ত শিক্ষার্থী ভর্তি করছে। এতে কাঙ্খিত শিক্ষণ-শিখন হচ্ছে না।
- **পূর্ণাঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়গত মূল্যায়ন:** বিশ্ব ব্যাংকের মূল্যায়ন রিপোর্ট অনুযায়ী আমাদের দেশের কতিপয় বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের গুণগতমান উৎকৃষ্ট বলে স্বীকৃতি পেয়েছে। যার ফলে কয়েকটি বিশ্ববিদ্যালয়ের কতিপয় বিষয়ের গ্রাজ্যুয়েটদের (B.B.A, M.B.A, CSE) চাহিদা এবং উচ্চ বেতনের চাকরি প্রাপ্তির সুযোগ হয়েছে। তবে অধিকাংশ বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের ভৌত অবকাঠামোগত, শিক্ষক ও জনবল কাঠামো শিক্ষার গুণগত মান স্বীকৃত নয়। যার ফলে এদেরকে পূর্ণাঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয় বলা চলে না। এসব শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে অর্থ বাণিজ্য কিংবা সম্পদ বাণিজ্যে অব্যাহত রয়েছে। কাঙ্খিত গুণগত শিক্ষার মান বলতে সবকিছুই অনুপস্থিত। তাই সরকার এসব বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার গুণগতমান উন্নয়নের জন্য বার বার নির্দেশনা ও পরামর্শ দিয়ে চলছে।

বর্তমানে বাংলাদেশে উচ্চশিক্ষা গ্রহণের চাহিদা প্রতিনিয়ত বৃদ্ধি পেয়ে চলছে বিধায় বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় বেশি প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। এদেশের উত্তম ও মানসম্মত কয়েকটি বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের মাঝে নিচেরগুলো বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য–

- নর্থ সাউথ ইউনিভার্সিটি– ঢাকা;
- ব্র্যাক ইউনিভার্সিটি– ঢাকা;
- খান বাহাদুর আহসান উল্লা বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়– ঢাকা;
- বাংলাদেশ ইন্ডিপেন্ডেন্ট ইউনিভার্সিটি– ঢাকা;
- ইস্ট ওয়েস্ট ইউনিভার্সিটি– ঢাকা;
- আশা ইউনিভার্সিটি– ঢাকা;
- ইউনাইটেড ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি– ঢাকা;
- নর্দান ইউনিভার্সিটি– ঢাকা;
- সাউথ-ইষ্ট-ইউনিভার্সিটি– ঢাকা;
- গণবিশ্ববিদ্যালয়– সাভার এবং
- ইন্টারন্যাশনাল বিজনেস, এগ্রিকালচার এন্ড টেকনোলজিক্যাল ইউনিভার্সিটি– ঢাকা ইত্যাদি।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ৪.২

ক. বহু নির্বাচনী প্রশ্ন

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন।

১. স্যাডলার কমিশন অনুযায়ী কোন বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপিত হয়?
   ক. রাজশাহী বিশ্ববিদ্যায়
   খ. ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
   গ. চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়
   ঘ. রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়

২. বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় অধ্যাদেশ কত সালে জারী হয়?
   ক. ১৯৯০ সালে
   খ. ১৯৯১ সালে
   গ. ১৯৯২ সালে
   ঘ. ১৯৯৩ সালে

৩. বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষার স্তর কয়ভাগে বিভক্ত?
   ক. ২
   খ. ৩
   গ. ৪
   ঘ. ৫

উত্তরমালা: ১. খ, ২. গ, ৩. খ

খ. সংক্ষিপ্ত উত্তরমূলক প্রশ্ন

১. বিশ্ববিদ্যালয়-এর প্রকারভেদ উল্লেখ করুন।
২. কলেজের প্রকারভেদ লিখনু।

গ. রচনামূলক উত্তর প্রশ্ন

১. উচ্চশিক্ষার ক্ষেত্রে সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের বর্তমান অবস্থা বিশ্লেষণ করুন।
২. উচ্চশিক্ষার ক্ষেত্রে বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের ভূমিকা সম্পর্কে আপনার মতামত দিন।

পাঠ ৪.৩: উচ্চশিক্ষায় প্রশাসন, ব্যবস্থাপনা ও অর্থায়ন

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি–

- সরকারি বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন ও ব্যবস্থাপনার কার্যাবলি বর্ণনা করতে পারবেন।
- বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন ও ব্যবস্থাপনার গুরুত্বপূর্ণ দিকসমূহ চিহ্নিত করতে পারবেন।
- সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থায়নে উৎস ও বরাদ্দের প্রক্রিয়া বর্ণনা করতে পারবেন।
- সরকারি কলেজের অর্থ বরাদ্দের প্রক্রিয়া বর্ণনা করতে পারবেন।

যে কোন দেশের যে কোন স্তরের শিক্ষা ব্যবস্থার উন্নয়ন অগ্রগতি নির্ভর করে তার যথার্থ প্রশাসনিক ব্যবস্থাপনার উপর। উচ্চশিক্ষা ক্ষেত্রে বিষয়টির তীব্র প্রয়োজনীয়তা রয়েছে। উচ্চশিক্ষা স্তরে শিক্ষা কার্যক্রমের সার্বিক পরিসর যেমন অত্যন্ত ব্যাপক তেমনিভাবে দক্ষ, অভিজ্ঞ ও তীক্ষ্ম বুদ্ধিমত্তাপূর্ণ চৌকস প্রজ্ঞাধারী ব্যক্তিবর্গ এতে শিক্ষণ শিখনের দায়িত্বে সংশ্লিষ্ট থাকেন। তাঁদের কার্য উদ্দীপনা বৃদ্ধি প্রশিক্ষণ প্রদান, যথার্থ সম্মানী ও ভাতা প্রদান, দাপ্তরিক অবস্থান দান, শিক্ষণ-শিখনের অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টি ইত্যাদি যাবতীয় কার্যক্রমের সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনার জন্য যথার্থ ও কাঙ্খিত সুশাসন এবং ব্যবস্থাপনা একান্ত অপরিহার্য। উচ্চশিক্ষা অর্জনের প্রধান আলয় হল বিশ্ববিদ্যালয়। আমাদের দেশেও বর্তমানে উন্নত বিশ্বের চেতনায় সরকারি বা বেসরকারিভাবে বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। উচ্চশিক্ষার কাঙ্খিত উন্নয়নের জন্য এসব প্রতিষ্ঠানের যথার্থ প্রশাসনিক ব্যবস্থাপনা কার্যক্রম সম্পন্ন করা একান্ত অপরিহার্য। পাশাপাশি উচ্চশিক্ষা কার্যক্রম সঠিকভাবে পরিচালনার জন্য প্রয়োজনীয় অর্থের যোগান এবং তার বাস্তবভিত্তিক প্রয়োগ করবেন উক্ত শিক্ষা স্তরের শিক্ষা প্রশাসক ও ব্যবস্থাপকবৃন্দ। উচ্চশিক্ষার উন্নয়নে নিবেদিত প্রশাসন বিভিন্ন সংগঠন এবং কর্তৃপক্ষ এতে সাবিক সহায়তা প্রদান করার জন্যই প্রতিষ্ঠিত এবং নিবেদিত রয়েছে। উচ্চশিক্ষায় রয়েছে প্রশাসন ও তার ব্যবস্থাপনা।

সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রশাসন ও ব্যবস্থাপনা

সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রশাসন ও ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্র অত্যন্ত ব্যাপক। কারন সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের কার্য পরিসর সুবিস্তৃত। কাজেই এর জনবল কাঠামোও সর্ববৃহৎ কলেবর যুক্ত। সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়গুলো সর্বদায় দেশের চাহিদা মতো উচ্চশিক্ষা কার্যক্রম সম্পাদনে নিবেদিত। এর সাথে দেশের সর্বাধিক প্রজ্ঞাধারী আলোকিত ব্যক্তিবর্গ সংশ্লিষ্ট রয়েছেন। আবার দেশের তীক্ষ্ম মেধার বিপুল সংখ্যক শিক্ষার্থী তরুন বয়সে অধ্যয়নের ব্রত নিয়ে এতে পদার্পণ করে। তাদেরকে যথার্থ জ্ঞান চর্চা করার অবারিত সুযোগ দেয়া দেশের উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠান তথা সরকারি বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসনের নৈতিক এবং মূল দায়িত্ব। এতে দায়িত্ব প্রাপ্ত ব্যক্তিবর্গের অবহেলা বা শৈথিল্য প্রদর্শনের কোন সুযোগ নেই। সুতরাং এ গুরুত্বের তীব্রতা বিবেচনা করেই দেশের সরকারি বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন পরিচালনা ও ব্যবস্থাপনায় সাংবিধানিক স্বীকৃতিতে আইন, সংগঠন, সংস্থা, কর্তৃপক্ষ ও প্রশাসনিক ব্যবস্থাপনার বিভাজন তৈরি হয়েছে। যেমন-

- বিশ্ববিদ্যালয় আইন (Acts);
- বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশন (UGC)।

সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রশাসনিক ব্যবস্থাপনা কার্যক্রম

১৯৭৩ সালের বিশ্ববিদ্যালয় অধ্যাদেশ অনুসারে এদেশের সরকারি বিশ্ববিদ্যালয় এর প্রশাসনিক ব্যবস্থাপনা কার্যক্রম পরিচালিত হয়ে আসছে। বিশ্ববিদ্যালয় স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠান হিসেবে এর কার্যক্রম ব্যাপক পরিসরে পরিবৃত্ত হয়েছে। বিশ্ববিদ্যালয় অধ্যাদেশ এবং স্বায়ত্তশাসিত আইন এর প্রশাসনিক ব্যবস্থাপনার রক্ষা কবচ। বিশ্ববিদ্যালয় স্বায়ত্তশাসন ক্ষমতা বলে বিশেষ কতগুলো ক্ষেত্রে চরম স্বাধীনতা ভোগ করে থাকে। উদাহরণস্বরূপ বলা যায় শিক্ষার্থী নির্বাচন ও ভর্তি, শিক্ষক নিয়োগ ও পদোন্নতি, শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যসূচি প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন এবং শিক্ষা কার্যক্রম পরিচালনা ইত্যাদি। সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রশাসন ও ব্যবস্থাপনা কার্যক্রম সিন্ডিকেট, সিনেট ইউজিসি-এর কার্যক্রম, উপাচার্যের ব্যবস্থাপনা কার্যক্রম, রেজিস্টারের কার্যক্রম, পরীক্ষা নিয়ন্ত্রকের কার্যক্রম এবং শিক্ষাক্রম পাঠ্যসূচি প্রণয়ন কমিটি ও একাডেমিক কাউন্সিল ইত্যাদির সামগ্রিক কার্য সমন্বয়ের মাধ্যমে পরিচালিত হয়। সরকারি বিশ্ববিদ্যালয় এর প্রশাসনিক ব্যবস্থাপনা কার্যক্রমের কয়েকটি দিক নিচে বর্ণনা করা হলো–

⇒ **বিশ্ববিদ্যালয় সিন্ডিকেট এর কার্যক্রমঃ** সরকারি বিশ্ববিদ্যালয় আইন অনুযায়ী সিন্ডিকেট (Syndicate) হল বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রশাসন ও ব্যবস্থাপনার সর্বোচ্চ পরিষদ। বিশ্ববিদ্যালয়ের নির্বাহী সংস্থা হিসেবে সিন্ডিকেট বিশ্ববিদ্যালয়ের যাবতীয় ক্রিয়া-কলাপ, আর্থিক বিষয়াদি, সাধারণ ব্যবস্থাপনা ও বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক নিয়োগ অনুমোদন ইত্যাদি কার্যক্রম তত্ত্বাবধান করে থাকে। বিশ্ববিদ্যালয়ের সিন্ডিকেট সর্বোচ্চ ১৭ জন সদস্য নিয়ে গঠিত হতে পারে। তবে দুই একটি ক্ষেত্রে এর সদস্য সংখ্যা আরো কিছু কম হতে পারে। পদাধিকার হিসেবে সদস্য সচিব, সদস্য এবং বিভিন্ন ক্যাটাগরি থেকে নির্বাচিত ও মনোনীত সদস্যবৃন্দ নিয়ে বিশ্ববিদ্যালয় সিন্ডিকেট গঠিত হয়।

⇒ **সিনেট এর কার্যক্রমঃ** বিশ্ববিদ্যালয় অধ্যাদেশ অনুযায়ী ঢাকা, রাজশাহী, চট্টগ্রাম, জাহাঙ্গীরনগর এবং খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়ে একটি প্রতিনিধিত্বমূলক কর্তৃপক্ষ রয়েছে যাকে সিনেট (Synate) বলা হয়। পদাধিকার হিসেবে সদস্য শিক্ষক প্রতিনিধি, রেজিস্টার্ড গ্রাজুয়েট, ছাত্র প্রতিনিধি এবং বিভিন্ন ক্যাটাগরির মনোনীত সদস্যবর্গ নিয়ে বিশ্ববিদ্যালয় সিনেট গঠিত হয়। ১৯৭৩ সালের বিশ্ববিদ্যালয় অধ্যাদেশ অনুযায়ী সিনেটের ক্ষমতা ও কাজের কয়েকটি দিক নিচে উল্লেখ করা হল–

- সিন্ডিকেটের প্রস্তাব অনুযায়ী স্টেটিউট সংবিধি অনুমোদন ও সংশোধন কিংবা বাতিল করা;
- সিন্ডিকেট কর্তৃক উপস্থাপিত বার্ষিক রিপোর্ট, আয় ব্যয় হিসাবে এবং আর্থিক প্রাক্কলন বাতিল;
- বিবেচনা ও অনুসরণ করা;
- আইন ও সংবিধান দ্বারা অর্পিত ক্ষমতার প্রয়োগ করা ও দায়িত্ব পালন করা।

⇒ **UGC-এর কার্যক্রমঃ** ১৫ ফেব্রুয়ারি ১৯৭৩ এর রাষ্ট্রপতির অধ্যাদেশ অনুযায়ী বাংলাদেশ বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশন (BUGC) একটি সংবিধিবদ্ধ প্রতিষ্ঠান হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হয়। পরে ১৯৯৮, ২০০৫ এবং ২০০৭ এর সংশোধিত আইন মোতাবেক ১৫সদস্য বিশিষ্ট BUGC গঠিত হয়। এর ভূমিকা এবং ক্ষমতার কতিপয় দিক নিচে উল্লেখ করা হলো-

- বিশ্ববিদ্যালয়ের চাহিদা নিরূপণ এবং উচ্চশিক্ষার মান রক্ষা;
- বিশ্ববিদ্যালয়ের আর্থিক চাহিদা নিরূপণ ও বরাদ্দ প্রাপ্তির সুপারিশকরণ;
- বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার মান উন্নয়নের কার্য মূল্যায়ন;
- বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার সনদ বা অনুদান;
- বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার মান তত্ত্বাবধান।

⇒ **আচার্য বা চ্যান্সেলরের কার্যক্রম:** বিশ্ববিদ্যালয় আইন অনুযায়ী বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসনের সর্বোচ্চ কর্মকর্তা হলেন আচার্য বা চ্যান্সেলর। আমাদের দেশে সাংবিধানিকভাবে রাষ্ট্রপতি বা প্রেসিডেন্ট পদাধিকার বলে চ্যান্সেলর এর দায়িত্ব পালন করেন। বিশ্ববিদ্যালয় পরিচালনার ক্ষেত্রে তার গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে। তার ক্ষমতা ও দায়িত্বের অন্যতম প্রধান দিক হল–

- সিনেট সুপারিশকৃত তিন নাম বিশিষ্ট প্যানেল হতে চ্যান্সেলর বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য ভাইস চ্যান্সেলর নিয়োগ করেন।
- কোন কোন ক্ষেত্রে সরাসরি ভিসি নিয়োগ দেন।
- বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাবর্তন অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন ও সনদ বিতরণ করেন।

⇒ **একাডেমিক কাউন্সিলের কার্যক্রম:** বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ে একাডেমিক কাউন্সিল হল একাডেমিক সংস্থা। বিশ্ববিদ্যালয় আইন অনুসারে পদাধিকার সদস্য, বিভিন্ন ক্যাটাগরির মনোনীত বা নির্বাচিত সদস্য নিয়ে এটি গঠিত হয়। একাডেমিক কাউন্সিলের কতিপয় কার্যক্রম নিচে উল্লেখ করা হল–

- সকল একাডেমিক কার্যক্রম লক্ষ্য, উদ্দেশ্য ও কর্মসূচির বাস্তবায়ন ও তত্ত্বাবধান করা।
- শিক্ষার উন্নয়ন পরিকল্পনা, প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন করা।
- শিক্ষক প্রশিক্ষণ ও পরীক্ষার মান উন্নয়ন করা।
- শিক্ষা সংক্রান্ত সকল বিষয়ে সিন্ডিকেটকে পরামর্শ দেয়া।

⇒ **উপাচার্য বা ভাইস চ্যান্সেলর ব্যবস্থাপনা কার্যক্রম:** বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রশাসনিক ও ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে উপাচার্য বা ভাইস চ্যান্সেলর হলেন পদাধিকার বলে প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা। তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ের একাডেমিক এবং প্রশাসনিক কাজের প্রধান নির্বাহী। তিনি সিনেট, সিন্ডিকেট ও একাডেমিক কাউন্সিলের সভার সভাপতির দায়িত্ব পালন করেন। বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ কমিটি বা বোর্ডের সভাপতির দায়িত্বও তিনি পালন করেন। বিশ্ববিদ্যালয় আইন দ্বারা স্বীকৃত ভাইস চ্যান্সেলর (ভিসি) এর ক্ষমতা ও দায়িত্বের কয়েকটি দিক নিচে তুলে ধরা হলো–

- বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন বিভাগ ও অধিভূক্ত কলেজের সার্বিক তত্ত্বাবধান করেন ভিসি।
- তিনি সরকার এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের যোগাযোগ রক্ষা করেন।
- বিশ্ববিদ্যালয়ের কাজের সাথে সংশ্লিষ্ট সংস্থা ও কর্তৃপক্ষের কার্য সমন্বয় করেন।
- নতুন বিভাগ খোলা এবং শিক্ষক নিয়োগের দায়িত্ব তিনি পালন করেন।

⇒ **উপ-উপাচার্যের কার্যক্রম:** বিশ্ববিদ্যালয় আইন দ্বারা স্বীকৃত বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্যের পরবর্তী নির্বাহী কর্মকর্তা হলেন প্রো-ভাইস চ্যান্সেলর। তাঁকে বিশ্ববিদ্যালয় পরিচালনায় অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ প্রশাসনিক ব্যবস্থাপনা দায়িত্ব পালন করতে হয়। বিশ্ববিদ্যালয় অধ্যাদেশ অনুযায়ী প্রো-ভাইস চ্যান্সেলরের ক্ষমতা ও দায়িত্বেও কতিপয় দিক নিচে উল্লেখ করা হল–

- ভাইস চ্যান্সেলরের অনুপস্থিতিতে পদাধিকার বলে প্রো-ভাইস চ্যান্সেলরকে উক্ত দায়িত্ব পালন করতে হয়।
- তৃতীয় এবং চতুর্থ শ্রেণির কর্মচারী নিয়োগ ও পদোন্নতি নিয়ন্ত্রণ করে থাকেন।
- বিভিন্ন কমিটির সভাপতির দায়িত্ব পালন করেন।

⇒ **ট্রেজারার এর প্রশাসনিক কার্যক্রম:** বিশ্ববিদ্যালয় আইনে ট্রেজারার নিয়োগ করার বিধান রয়েছে। ১৯৯২, ১৯৯৭ ও ২০০৭ এর সংশোধিত বিশ্ববিদ্যালয় আইন অনুযায়ী প্রতিষ্ঠাতাদের সুপারিশ মোতাবেক সংশ্লিষ্ট

বিশ্ববিদ্যালয়ের ট্রেজারার নিয়োগ করেন চ্যান্সেলর। ট্রেজারার চার বছরের জন্য নিয়োগ প্রাপ্ত হন। ট্রেজারার এর ক্ষমতা ও দায়িত্বাবলির কতিপয় দিক নিচে উপস্থাপন করা হল–

- বিশ্ববিদ্যালয়ের অভ্যন্তরীণ সকল কার্যাবলি তদারকী করেন ট্রেজারার।
- শিক্ষার সার্বিক মান উন্নয়নের পরিকল্পনা প্রণয়ন, বাস্তবায়ন ও তত্ত্বাবধান করেন তিনি।
- অর্থ ও শৃঙ্খলা ব্যবস্থাপনার দায়িত্ব পালন করেন।

⇒ **রেজিস্টার এর প্রশাসনিক কার্যক্রমঃ** বিশ্ববিদ্যালয় পরিচালনার ক্ষেত্রে রেজিস্টার এর দায়িত্ব অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। বিশ্ববিদ্যালয়ের অভ্যন্তরীণ প্রশাসনিক ব্যবস্থাপনা অনেকটা তাঁর নিয়ন্ত্রণে পরিচালিত হয়। বিশ্ববিদ্যালয়ের আইনে স্বীকৃত রেজিস্টার এর দায়িত্ব ও কর্তব্যের প্রধান দিক নিচে উল্লেখ করা হলো–

- শিক্ষক নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রদান ও নিয়োগ দান তার দাপ্তরিক কার্যভূক্ত।
- উন্নয়ন ও অর্থ সংক্রান্ত কার্যক্রমের তত্ত্বাবধান করা।
- বিভিন্ন বিভাগ, পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসনিক কার্য সমন্বয় করা।

⇒ **ডীন এর প্রশাসনিক ব্যবস্থাপনা কার্যক্রমঃ** বিশ্ববিদ্যালয়ের অভ্যন্তরীণ প্রশাসনিক বিভাজনে বিভিন্ন অনুষদ থাকে যার কর্তাব্যক্তি হিসেবে ডীন দায়িত্ব পালন করেন। ডীন এর পদবী এবং দায়িত্ব কর্তব্য বিশ্ববিদ্যালয়ের আইন দ্বারা স্বীকৃত থাকে। বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন সামঞ্জস্যপূর্ণ বিভাগ নিয়ে বিভিন্ন অনুষদ গঠিত হয়। আর সে অনুষদ অনুযায়ী ডীন মনোনীত বা নির্বাচিত হন অধীনস্থ বিভাগের বিভাগীয় প্রধান অথবা অধ্যাপক পদ মর্যাদার ব্যক্তি। ডিনের কার্যাবলির কয়েকটি দিক নিচে উল্লেখ করা হয়-

- ডীন অনুষদের বিভাগগুলোর কার্যাবলির আন্ত সমন্বয় করেন।
- শিক্ষক নিয়োগ ও পদোন্নতির সহযোগিতা করেন।
- অনুষদ ভিত্তিক শিক্ষার উন্নয়ন তত্ত্বাবধান করেন।

⇒ **পরীক্ষা নিয়ন্ত্রকের কার্যক্রমঃ** বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ে গুরুত্বপূর্ণ প্রশাসনিক শাখা হল পরীক্ষা নিয়ন্ত্রকের দপ্তর। বিশ্ববিদ্যালয় আইন অনুযায়ী অধ্যাপক এর পদ মর্যাদার অধিকারী ব্যক্তি পরীক্ষা নিয়ন্ত্রকের দায়িত্ব পালন করেন। তাঁর অধীনে রয়েছে উপ-পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক, সহকারী পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক এবং সেকশন অফিসার ও কর্মচারীবৃন্দ এ দপ্তরে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এবং গোপনীয় কার্যক্রম পরিচালনা করতে হয়। যেমন–

- সময় মতো পরীক্ষার প্রশ্নপত্র প্রণয়ন, মূল্যায়ন ও মুদ্রণ।
- নির্ধারিত পরীক্ষা কমিটি গঠন করে পরীক্ষা গ্রহণ ও গোপনীয়তা রক্ষা।
- উত্তরপত্রের পরীক্ষক দ্বারা মূল্যায়ন এবং ফলাফল প্রদান।
- ফলাফল অনুযায়ী সনদ তৈরি এবং প্রদান।

বিভাগীয় প্রধানের প্রশাসনিক কার্যক্রমঃ প্রতিটি সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে বিভিন্ন বিভাগের প্রধান কর্তাব্যক্তি হিসেবে বিভাগীয় প্রধান রয়েছেন। যাকে কেন্দ্র করে বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন বিভাগীয় প্রশাসনিক ব্যবস্থাপনা কার্যক্রম সুষ্ঠুভাবে পরিচালিত হয়। তার অধীনে রয়েছেন বিভাগের অধ্যাপক, সহযোগী অধ্যাপক, সহকারী অধ্যাপক, প্রভাষক এবং সেকশন অফিসার, ল্যাব অ্যাসিসটেন্স এবং অন্যান্য কর্মচারি। বিভাগীয় প্রধানের/চেয়ারম্যানের ক্ষমতা ও নিয়ন্ত্রণ করা।

- কোর্স কার্যক্রম তদারকী ও নিয়ন্ত্রণ করা।
- বিভাগীয় শিক্ষক, কর্মকর্তা কর্মচারীর নিয়োগ ও পদোন্নতির সুপারিশ করা।

- সময় মতো বিভাগের পরীক্ষা সমাপ্ত করণ ও চারিত্রিক সনদ প্রদান করা।

⇒ **প্রক্টর এর কার্যক্রমঃ** বিশ্ববিদ্যালয়ের অভ্যন্তরীণ আইন শৃঙ্খলা রক্ষা এবং শিক্ষণ-শিখন কার্যক্রমের কাঙ্খিত পরিবেশ তৈরি ও সকল ছাত্র ছাত্রীর মনোরম সতীর্থ শিক্ষণ সহাবস্থান, সম্প্রীতিমূলক চেতনা বজায় রাখার জন্য পূর্ণাঙ্গ অধ্যাপকের পদমর্যাদার প্রক্টর পদবী রয়েছে। প্রক্টরের ক্ষমতা ও দায়িত্ব কর্তব্য বিশ্ববিদ্যালয় আইন দ্বারা স্বীকৃত। বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্ষেত্রে প্রক্টর যে সব দায়িত্ব পালন করেন তার মাঝে নিচের গুলো বিশেষভাবে উল্লেখ্য-

- অভ্যন্তরীণ আইন শৃঙ্খলা রক্ষা করা।
- বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষণ-শিখনের মনোরম পরিবেশ তৈরি করা।
- সম্প্রীতিমূলক সহাবস্থান চেতনার সম্প্রসারণ করা।

⇒ **প্রভোস্ট এর প্রশাসনিক ব্যবস্থাপনা কার্যক্রমঃ** বিশ্ববিদ্যালয়ের আবাসিক পর্যায়ের প্রতিটি আবাসিক হলের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা হলেন হল প্রাধ্যক্ষ বা প্রভোস্ট। তার অধীনে আছেন সহকারী প্রভোস্ট, হাউজ টিউটর এবং সেকশন অফিসার ও হল কর্মচারীবৃন্দ। তাঁর মাধ্যমেই শিক্ষার্থীদের আবাসিক সমস্যা, সমাধান এবং তার প্রশাসনিক ব্যবস্থাপনা কার্যক্রম পরিচালিত হয়ে থাকে। বিশ্ববিদ্যালয় অধ্যাদেশ অনুযায়ী প্রভোস্টেও ক্ষমতা ও দায়িত্বের কতিপয় দিক নিচে উল্লেখ করা হলো–

- আবাসন শৃঙ্খলা পরিপন্থী কোন কার্যক্রমের জন্য আবাসিক শিক্ষার্থীর আবাসন বাতিল করা।
- আবাসনের সার্বিক শিক্ষণ-শিখন পরিবেশ বজায় রাখা।
- আবাসন ব্যবস্থাপনার সার্বিক উন্নয়ন করা।
- আবাসন কার্যক্রমের সার্বিক তত্ত্বাবধান করা এবং শিক্ষার্থীর আবাসন সনদ দেয়া।

বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রশাসন ও ব্যবস্থাপনা

আমাদের দেশে বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার ইতিহাস খুব বেশি দিনের পুরানো নয়। বিগত নব্বই এর দশকে জাতীয় সংসদে বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার বিল পাশ হবার পর পরই নির্ধারিত নিয়ম নীতির অনুসরণ করে ইউজিসি এবং সরকার অনুমোদন সাপেক্ষে বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়। গড়ে উঠে প্রাতিষ্ঠানিক পর্যায়ে বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন ও ব্যবস্থাপনা। বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ে এর প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থাপনার সর্বোচ্চ পর্যায়ে রয়েছেন উপাচার্য বা ভাইস চ্যান্সেলর। তাঁকে কেন্দ্র করেই এর অন্যান্য প্রশাসনিক ব্যবস্থাপনার কার্যধাপ বিন্যস্ত রয়েছে। যা অনেকটা সরকারি বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন ও ব্যবস্থাপনা এর আদলে গড়া।

বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় এর প্রশাসনিক ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে বিশ্ববিদ্যালয় অ্যাক্ট, মঞ্জুরি কমিশনের নীতিমালা, বোর্ড অব গভর্নস বা স্ট্রাস্টি বোর্ডের বিধি বিধান, শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের অধ্যাদেশ ও প্রজ্ঞাপন ইত্যাদি অবশ্যই মেনে চলতে হয়। এসবের আলোকে বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস চ্যান্সেলরকে অত্যন্ত দক্ষতার সহিত এর প্রশাসনিক ব্যবস্থাপনা কার্যক্রম সুসম্পন্ন করতে হয়। এক্ষেত্রে তাঁর অধীনস্ত বিভিন্ন সেক্টরিয়াল প্রশাসন এবং বিভাগীয় প্রশাসনিক ব্যবস্থাপনা কার্যক্রম প্রাতিষ্ঠানিক উন্নয়ন অগ্রগতিতে সার্বিক সহযোগিতা করে থাকে। এর সব কিছুর নিয়ন্ত্রণ করেন ভিসি নিজে। বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রশাসন ও ব্যবস্থাপনার কয়েকটি দিক নিচে উল্লেখ করা হলো–

- বিশ্ববিদ্যালয় অ্যাক্ট এর বিধি বিধান;
- বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশন;
- উপাচার্য এর প্রশাসনিক ব্যবস্থাপনা;
- বোর্ড অব গভর্নস এর ব্যবস্থাপনা;

- রেজিস্টারের কার্যক্রম ব্যবস্থাপনা;
- পরীক্ষা নিয়ন্ত্রকের কার্যক্রম ব্যবস্থাপনা;
- উপ-উপাচার্য এর প্রশাসনিক ব্যবস্থা;
- বিভাগীয় প্রধান/চেয়ারম্যান এর কার্যক্রম ব্যবস্থাপনা;
- বিভিন্ন ডাইরেকন্টরগণের প্রশাসনিক ব্যবস্থাপনা।

উপরোক্ত বিভিন্ন এ্যাক্ট, সংগঠনের নীতিমালা এবং ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষের অনুসৃত নিয়মনীতিতে একটি বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় পরিচালিত হয়। এর পরিচালনায় সংশ্লিষ্ট সকলকেই যথার্থ নীতির অনুশীলনে অর্পিত দায়িত্ব সঠিকভাবে পালন করতে হয়। বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে ভিসির একক কর্তৃত্ব থাকলেও তাঁর একার পক্ষে এটি পরিচালনা করা সম্ভব নয়। কাজেই বিশ্ববিদ্যালয়ের মতো বৃহৎ প্রতিষ্ঠান পরিচালনায় সংশ্লিষ্ট সকলের সহযোগিতা প্রাপ্তি তাঁর জন্য একান্ত অপরিহার্য।

বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রশাসনিক কাঠামো

বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রশাসনিক কাঠামোর মাঝে সর্বোচ্চ পর্যায়ের প্রশাসনিক ব্যবস্থাপক হিসেবে আছেন উপাচার্য বা ভাইস চ্যান্সেলর। তাঁর অধ:স্তনে আছে– উপ-উপাচার্য বা প্রো-ভাইস চ্যান্সেলর এবং ট্রেজারার। এর পরবর্তীতে রয়েছেন বিভিন্ন সেক্টরের সেক্টরিয়াল প্রধানগণ। যেমন– রেজিস্টার, কন্ট্রোলার, প্রক্টর, বিভাগীয় প্রধান বা চেয়ারম্যান এবং বিভিন্ন ডাইরেক্টরবৃন্দ। তাঁদের অধীনে আবার বিভিন্নভাবে অধ:স্তনগণ প্রশাসনিক ব্যবস্থাপনার উপধাপে বিন্যস্ত রয়েছেন।

এক্ষেত্রে উদাহরণ স্বরূপ বলা যায়– কন্ট্রোলারের অধীনে আছেন ডেপুটি কন্ট্রোলার, তাঁর অধীনে অ্যাসিস্ট্যান্ট কন্ট্রোলার এবং সেকশন অফিসারবৃন্দ। উচ্চশিক্ষা প্রশাসনিক কাঠামোর সকল স্তরে সংশ্লিষ্ট সকলের দায়িত্বপূর্ণ কার্য সহযোগিতার মাধ্যমে বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রশাসনিক ব্যবস্থাপনা কার্যক্রম সম্পন্ন হয়। এক্ষেত্রে কোন সেক্টরের কাজকে বাদ দিয়ে অন্য সেক্টরের গুরুত্ব নয়। বরং প্রয়োজনীয় সকল সেক্টরের কার্যক্রমের অগ্রগতির জন্য যথার্থ প্রশাসনিক ব্যবস্থাপনা করতে হবে।

বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রশাসন ও ব্যবস্থাপনা কার্যক্রম

আগস্ট ১৯৯২ সালের বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় অধ্যাদেশ বলে বাংলাদেশে বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়েছে এবং এখনও প্রতিষ্ঠিত হয়ে চলছে, ভবিষ্যতেও প্রতিষ্ঠিত হবে। যার ফলে সরকার ১৯৯২ সালের বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় অধ্যাদেশকে ১৯৯৮, ২০০৫ এবং ২০০৭ সালে কিছুটা সংশোধন করে বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা, পরিচালনা এবং তার প্রশাসনিক ব্যবস্থাপনা কার্যক্রমকে অনেক সংস্কার সাধন করেছেন। সে অনুযায়ী বর্তমানে বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের উপর ইউজিসির কর্তৃত্ব বেড়েছে। উক্ত আইন অনুযায়ী এদেশের বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রশাসন এবং ব্যবস্থাপনায় সুনির্ধারিত কর্তৃপক্ষ ও কর্মকর্তার কার্যাবলি সংযুক্ত হয়েছে। তবে বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়কে সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার জন্য চ্যান্সেলরের অনুমতি নিয়ে নির্ধারিত কর্তৃপক্ষ প্রয়োজনবোধে অভ্যন্তরীণ কর্মকর্তার পদ/পদবীর কিছুটা হ্রাস বৃদ্ধি করতে পারেন। যাদের সঠিক কার্য সমন্বয়ের মাধ্যমে বেসকরারি বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন ও ব্যবস্থাপনা সঠিকভাবে পরিচালিত হবে। বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রশাসনিক ব্যবস্থাপনায় সুনির্ধারিত কর্তৃপক্ষ এবং কর্মকর্তার, সংগঠন কিংবা কমিটির প্রশাসন ও ব্যবস্থাপনা কার্যক্রম সংক্ষিপ্ত রূপে নিচে বর্ণনা করা হলো–

চ্যান্সেলর এর প্রশাসনিক ব্যবস্থাপনা: বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় আইনে বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসনের সর্বোচ্চ কর্তা ব্যক্তি হলেন চ্যান্সেলর বা রাষ্ট্রপতি। এটি সাংবিধানিকভাবে স্বীকৃত। বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা, পরিচালনা এবং

প্রশাসনিক ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে চ্যান্সেলর এর দায়িত্ব অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। নিচে তাঁর ক্ষমতা ও ব্যবস্থাপনা কয়েকটি দিক উল্লেখ করা হলো–

- নির্ধারিত সুপারিশ অনুসারে চার বছরের জন্য তিনি বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস চ্যান্সেলর, প্রো-ভাইস চ্যান্সেলর এবং ট্রেজারার নিয়োগ দেন।
- বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা উন্নয়ন, সুপারিশ অনুমোদন করে।
- তিনি সমাবর্তনের মাধ্যমে সনদ প্রদান করেন।

⇒ **রিজেন্সি কাউন্সিল/ট্রাস্টিবোর্ড এর কার্যক্রমঃ** বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার উদ্যোক্তাকে নিয়েই ট্রাস্টিবোর্ড বা বোর্ড অব ট্রাস্টি বা রিজেন্সি কাউন্সিল গঠিত হয়। যাদেরকে মূলত পরিচালনা পর্ষদ নামে অভিহিত করা যায়। বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের আইন অনুযায়ী শিক্ষা, সংস্কৃতি, বিজ্ঞান, প্রযুক্তি, প্রশাসন ও অন্যান্য শিক্ষা সংশ্লিষ্ট বিশেষ ক্ষেত্রে সুপ্রতিষ্ঠিত, স্বনামধন্য এবং অভিজ্ঞতা সম্পন্ন ব্যক্তিবর্গকে নিয়ে একটি ট্রাস্টি বোর্ড গঠন করতে হবে। তারা অধিকন্তু বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে একাডেমিক ও প্রশাসনিক প্রয়োজনে অভ্যন্তরীণ সংবিধি প্রণয়ন করতে পারেন। তাদের বিশেষ কার্যক্রমভুক্ত হল–

- বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার অর্থ যোগান দেয়া।
- অভ্যন্তরীণ প্রশাসনিক কার্য-তদারকী ও নিয়ন্ত্রণ করা।
- সরকার এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের সার্বিক কার্য-সম্পন্ন করা।

⇒ **UGC-এর ব্যবস্থাপনা কার্যক্রমঃ** ১৫ ফেব্রুয়ারি ১৯৭৩ সালে রাষ্ট্রপতি অধ্যাদেশ ক্রমে এদেশে সর্বপ্রথম বাংলাদেশ ইউনিভার্সিটি গ্র্যান্ড কমিশন বা BUGC/UGC গঠিত হয়। পরবর্তীতে ১৯৯৮, ২০০৫ এবং ২০০৭ সালে এর ক্ষমতা ও দায়িত্ব কর্তব্য পালনের জন্য সংশোধিত আইন প্রণীত হয়। আগস্ট ১৯৯২ সাল হতে এদেশে বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার অধ্যাদেশ জারি হয়। যে ক্ষেত্রে ইউজিসির ক্ষমতা ও দায়িত্ব সম্প্রসারিত হয়। এক্ষেত্রে UGC যে সব দায়িত্ব পালন করেন তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য কয়েকটি হলো–

- বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার সনদ প্রদান।
- বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার মান উন্নয়ন ও তত্ত্বাবধান।
- উচ্চশিক্ষার মান রক্ষায় কার্যকরী ভূমিকা পালন।

⇒ **একাডেমিক কাউন্সিলের কার্যক্রমঃ** বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ে সাধারণত ৯ সদস্য বিশিষ্ট একাডেমিক কাউন্সিল গঠিত হয়। এর প্রধান কর্তা ব্যক্তি হলেন ভাইস চ্যান্সেলর বা রেক্টর। এটি বিশ্ববিদ্যালয় অধ্যাদেশ দ্বারা স্বীকৃত। বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার যথার্থ মান রক্ষায় এর ভূমিকা অপরিসীম। একাডেমিক কাউন্সিলের বহুবিদ কার্যক্রমের কতিপয় দিক নিচে উল্লেখ করা হলো-

- সকল কার্যক্রমের মাধ্যমে একাডেমিক মান উন্নয়ন করা।
- উচ্চশিক্ষার লক্ষ্য উদ্দেশ্য উন্নয়ন পরিকল্পনা ও কর্মসূচির বাস্তবায়ন করা।
- যোগ্যতম শিক্ষক নিয়োগের সুপারিশ করা।
- শিক্ষার উন্নয়ন কার্যক্রম বাস্তবায়নের সুপারিশ করা।

⇒ **ভাইস চ্যান্সেলর এর প্রশাসনিক ব্যবস্থাপনা কার্যক্রমঃ** বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রশাসনিক ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে সর্বোচ্চ নির্বাহী প্রশাসক হলেন ভাইস চ্যান্সেলর। তার ক্ষমতা এবং দায়িত্ব কর্তব্য সাংবিধানিক ভাবে বিশ্ববিদ্যালয় অধ্যাদেশ দ্বারা স্বীকৃত। তিনি সিন্ডিকেট, একাডেমিক কাউন্সিল, ফাইন্যান্স, সিলেকশন এবং স্কুল অব

স্টাডিস কমিটির সভাপতি। বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের চ্যান্সেলর এর ক্ষমতা এবং প্রশাসনিক ব্যবস্থাপনার কয়েকটি দিক নিচে উল্লেখ করা হলো-

- বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক নিয়োগ ও পদোন্নতি প্রদান।
- ডীন, রেজিস্টার, কন্ট্রোলার এবং অন্যান্য কর্মকর্তা নিয়োগ।
- উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের সাথে বিশ্ববিদ্যালয়ের কার্য-সম্পাদন করা।
- বিভিন্ন কমিটির সভাপতির দায়িত্ব পালন।

⇒ **প্রো-ভাইস চ্যান্সেলর এর কার্যক্রম:** বিশ্ববিদ্যালয়ের আইন দ্বারা প্রো-ভাইস চ্যান্সেলর বা প্রো-ভিসি এর ক্ষমতা এবং দায়িত্ব কর্তব্য স্বীকৃত রয়েছে। তিনি বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় এর গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষা প্রশাসক। বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস চ্যান্সেলর কর্তৃক অর্পিত দায়িত্ব ও ক্ষমতা অনুযায়ী তাঁকে দায়িত্ব পালন করতে হয়। প্রো-ভিসি তাঁর দায়িত্বের কতিপয় দিক নিচে উল্লেখ করা হলো–

- ভিসি এর অনুপস্থিতিতে তাঁর দায়িত্ব প্রো-ভিসি পালন করেন।
- বিভিন্ন অধ:স্তন শ্রেণির কর্মকর্তা কর্মচারী নিয়োগে সুপারিশ করেন।
- বিভিন্ন কমিটির কার্য তদারকী করেন।

⇒ **ট্রেজারার এর কার্যক্রম:** বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্ষেত্রে ট্রেজারার অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ পদ। তাকে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ নির্বাহী দায়িত্ব পালন করতে হয়। বিশ্ববিদ্যালয় অধ্যাদেশে তাঁর ক্ষমতা ও দায়িত্বাবলি স্বীকৃত রয়েছে। তিনি চার বছরের জন্য নির্ধারিত সুপারিশের ভিত্তিতে চ্যান্সেলর কর্তৃক নিয়োগপ্রাপ্ত হন। তার ক্ষমতা ও দায়িত্বেও কতিপয় দিক নিচে উল্লেখ করা হলো-

- বিশ্ববিদ্যালয়ের অভন্তরীণ সকল শিক্ষা কার্যক্রম তদারকী ও তত্ত্বাবধান করেন।
- শিক্ষার মন উন্নয়নের জন্য সুপারিশ প্রণয়ন করেন।
- শৃঙ্খলা এবং অর্থ ব্যবস্থাপনা নিয়ন্ত্রণ করেন।

⇒ **রেজিস্টার এর কার্যক্রম:** বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় অধ্যাদেশ অনুযায়ী রেজিস্টার অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ প্রশাসনিক পদ। তাঁকে বিশ্ববিদ্যালয়ে অভ্যন্তরীন নির্বাহী হিসেবে অভিহিত করা হয়। তিনি ভাইস চ্যান্সেলর কর্তৃক নিয়োগ প্রাপ্ত হন। তার দায়িত্ব কাল চার বছরের। বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রশাসনিক ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে রেজিস্টার এর দায়িত্বাবলির কতিপয় দিক নিচে উল্লেখ করা হলো–

- শিক্ষক নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি প্রদান এবং নিয়োগের ব্যবস্থা করেন।
- অভ্যন্তরীণ শিক্ষা বিভাগ খোলার ব্যবস্থা করেন।
- বিশ্ববিদ্যালয়ের এ্যাফিলিয়েশনের দায়িত্ব পালন করেন।
- বিভিন্ন কমিটির কার্যাবলী তত্ত্বাবধান করেন।
- শিক্ষার মান উন্নয়নে কার্যকরী পদক্ষেপ গ্রহণ করেন।

⇒ **কন্ট্রোলার এর কার্যক্রম:** যে কোন বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্ষেত্রে কন্ট্রোলার বা পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ পদ। কন্ট্রোলার পূর্ণাঙ্গ অধ্যাপকের পদ মর্যাদার অধিকারী। তিনি বিশ্ববিদ্যালয় আইন মোতাবেক পরীক্ষা সংক্রান্ত দায়িত্ব পালন করেন। যেমন–

- সঠিক সময়ে পরীক্ষা গ্রহণের ব্যবস্থা করা।
- প্রশ্নপত্রের প্রণয়ন, মুদ্রণ প্রেরণে গোপনীয়তা রক্ষা করা।

- পরীক্ষা কমিটির অনুমোদন ও দায়িত্ব দেয়া।
- উত্তরপত্রের মূল্যায়ন কার্য-তদারকীর পর ফলাফল দেয়া।
- ফলাফল অনুযায়ী স্বাক্ষরকৃত সনদ প্রদান করা।

⇒ **বিভাগীয় প্রধান এর প্রশাসনিক কার্যক্রম:** প্রতিটি বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন বিষয়ের বিভাগীয় প্রধান এর পদ স্বীকৃত রয়েছে। বিভাগীয় প্রধান তার অধীনে সহকারী সহকর্মীদেরকে নিয়ে বিভাগের অধ্যয়নের যাবতীয় বিষয়াদি দেখভাল করেন। তিনি অধ্যাপক পদ মর্যাদার হতে পারেন। তার অধীনে সাধারণত সহযোগী, সহকারী অধ্যাপক এবং প্রভাষক ও সেকশন অফিসারবৃন্দ কাজ করেন। তার দায়িত্ব কর্তব্যের কয়েকটি দিক নিচে উল্লেখ করা হল–

- বিভাগের ক্লাস রুটিন প্রণয়ন ও বাস্তবায়নকরণ।
- সময়মতো বিভাগের অধ্যয়ন কার্যক্রম সম্পাদনের তদারকীকরণ।
- নিয়মিত ক্লাস, পরীক্ষা তত্ত্বাবধান করা।
- শিক্ষার্থী ভর্তি, অধ্যয়ন শেষে চারিত্রিক সনদ প্রদান করা।

⇒ **ডীন এর কার্যক্রম:** বিশ্ববিদ্যালয়ের অভ্যন্তরীণ পারস্পরিক সম্পর্কযুক্ত ও সামঞ্জস্যপূর্ণ বিষয়ের সমন্বয়ে অনুষদ গঠিত হয়। আর এ অনুষদের প্রধান শিক্ষক কর্মকর্তা হলেন ডীন। তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ের নির্ধারিত অনুষদভুক্ত বিভিন্ন বিভাগের প্রধান কিংবা অধ্যাপক পদ মর্যাদার ব্যক্তি মনোনীত বা নির্বাচিত হন। তাঁর কার্যাবলির কয়েকটি দিক নিচে উল্লেখ করা হলো-

- অনুষদ ভুক্ত বিভাগের কার্যাবলির আন্ত:সমন্বয় করেন।
- শিক্ষার উন্নয়ন কার্যাবলি তত্ত্বাবধান করেন।
- শিক্ষক নিয়োগ ও পদোন্নতির সুপারিশ করেন।

⇒ **ডাইরেক্টর প্লানিং এর কার্যক্রম:** বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় পরিচালনার ক্ষেত্রে ভাইস চ্যান্সেলর কর্তৃক অভ্যন্তরীণ প্রশাসনিক ব্যবস্থাপনাকে সমৃদ্ধ ও গতিশীল করণের তাগিতে বিভিন্ন ধরনের ডাইরেক্টর নিয়োগ করতে হয়। ডাইরেক্টর প্লানিং তেমনি একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রশাসনিক পদ। এ পদে অধ্যাপক পদমর্যাদার ব্যক্তিকে নিয়োগ দিতে হয়। তার পদ বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় আইন দ্বারা স্বীকৃত আছে। ডাইরেক্টর প্লানিং এর কতিপয় কার্যক্রম নিচে উল্লেখ করা হল–

- বিশ্ববিদ্যালয়ের অভ্যন্তরীণ উন্নয়নের যথার্থ পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়নের সুপারিশ করা।
- বিভিন্ন বিভাগ, অনুষদে জনবল কাঠামো নিয়োগের সুপারিশ করা।
- বিশ্ববিদ্যালয়ের আয় ব্যয়ের সঙ্গতিতে পরিকল্পনাকরণ।

⇒ **ডাইরেক্টর ফিন্যান্স এর কার্যক্রম:** বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে ডাইরেক্টর ফিন্যান্স অত্যান্ত গুরুত্বপূর্ণ পদ। এতে অর্থ ব্যবস্থাপনার যথার্থ জ্ঞান সম্পন্ন ব্যক্তিকে নিয়োগ দেয়া হয়। তাঁর কতিপয় কার্যাবলি নিম্নরূপ–

- অর্থের ব্যবস্থাপনার স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা বজায় রাখা।
- আয় ব্যয়ের সঙ্গতি বিধান করা।
- অডিট এবং একাউন্টস ঠিক রাখা।

⇒ **ডাইরেক্টর একাডেমিক এর কার্যক্রম:** বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ে একাডেমিক কার্যক্রমের উন্নয়ন ও ব্যবস্থাপনার দেখভাল করেন একাডেমিক ডাইরেক্টর। তাকে বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ কাজ সম্পাদন করতে হয়। যেমন–

- একাডেমিক নিয়ম শৃঙ্খলা বজায় রাখা।
- বিভিন্ন বিভাগের শিক্ষণ-শিখন কার্যক্রম দেখভাল করা।
- অভ্যন্তরীণ জনবল নিয়োগ ও পদোন্নতির সুপারিশ করা।

⇒ **ডাইরেক্টর স্টুডেন্ট অ্যাফেয়ার্স এর কার্যক্রম:** বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষার্থী ভর্তি, বিভিন্ন প্রচার মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট থেকে শিক্ষার্থীও ক্রম সমাগম বৃদ্ধি করা এবং শিক্ষার্থী সংশ্লিষ্ট সমস্যাবলির সমাধান ও তত্ত্বাবধানের তাগিদে ডাইরেক্টর স্টুডেন্ট অ্যাফেয়ার্স পদবী সৃষ্টি করা হয়েছে। তিনি অধ্যাপক পদ মর্যাদার হন। তার প্রধান কার্যাবলির কয়েকটি হলো–

- বিশ্ববিদ্যালয়ে অধিক পরিমাণে শিক্ষার্থী ভর্তির প্রচার করা।
- শিক্ষার্থীর অভ্যন্তরীণ সমস্যাবলীর সমাধান দেয়া।
- শিক্ষার্থীর শিক্ষণ–শিখন সুযোগ সুবিধা বৃদ্ধির উদ্যোগ নেয়া।

কলেজ ব্যবস্থাপনা

সাধারণত সরকারি কলেজসমূহ শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের অধীনে প্রশাসন ও ব্যবস্থাপনা দ্বারা পরিচালিত হয়ে থাকে। বে-সরকারি কলেজসমূহ জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক প্রণীত নিয়মে পরিচালনা পর্ষদ বা গভর্ণিং বডি দ্বারা পরিচালিত হয়ে থাকে।

গভর্নিং বডির ক্ষমতা ও দায়িত্ব

১. গভর্নিং বডি অধ্যক্ষ, শিক্ষক, শারীরিক শিক্ষক, প্রশিক্ষক, গ্রন্থাগারিক, প্রদর্শক এবং ল্যাবরেটরী সহকারিসহ কর্মচারী নিয়োগের ব্যবস্থা করা;
২. শিক্ষকদের বরখাস্ত, অপসারণ অথবা নিম্ন র‍্যাংকে নামিয়ে দেয়া। তবে শর্তে যে কাউকে শুনানরি সুযোগ না দিয়ে ও পূর্ব অনুমোদন না নিয়ে এমন শাস্তিমূলক ব্যবস্থা দেয়া যাবেনা;
৩. গভর্নিং বডি কর্তৃক নিয়োগকৃতদের ছুটি, আর্থিক অগ্রীম বোনাস বা গ্রাচুইটি মঞ্জুরকরণ;
৪. পূরাতন সকল যন্ত্রপাতি, আসবাবপত্র ও বইপত্র ইত্যাদি বিক্রয়ের মাধ্যমে নিস্পত্তি এবং বিক্রয়রপ্ত অর্থ কলেজের সাধারণ ফান্ডে জমাকরণ;
৫. অ-আদায়যোগ্য ফি ও জরিমানা অব্যাহতি দানের ক্ষমতা;
৬. আসবাবপত্র, ভবন, জমি, যন্ত্রপাতি, বইপত্র ইত্যাদি ক্রয় ও মেরামত কাজে অর্থ ব্যয়ের মঞ্জুরী প্রদান;
৭. বোর্ডের দেয় সীমার মধ্যে ছুটির তালিকা প্রস্তুতকরণ;
৮. বিনা বেতনে ও অর্ধ বেতনে পড়ুয়া ছাত্রদের সংখ্যা নির্ধারণ এবং উপযুক্ত ছাত্র/ছাত্রীদের অন্যান্য আর্থিক সুবিধাদি প্রদান;
৯. শৃংঙ্খলামূলক মামলা বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ;
১০. কলেজের আর্থিক স্বচ্ছলতা, বার্ষিক বাজেট অনুদান ও নিয়ন্ত্রণ, হিসাব নিরীক্ষার ব্যবস্থাসহ যাবতীয় উন্নয়নমূলক পরিকল্পনা গ্রহণ ও বাস্তবায়ন; এবং
১১. বোর্ড বা সরকার কর্তৃক সময়ে-সময়ে দেয় অন্যান্য দায়িত্ব পালন।

সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থায়ন

সাধারণত অর্থায়ন বলতে কোন কার্য পরিচালনার ক্ষেত্রে প্রয়োজন এবং চাহিদা অনুযায়ী বিভিন্ন উৎস হতে সঠিক পরিমাণমতো অর্থের যোগান দিয়ে যথার্থ ব্যয় নির্বাহের প্রক্রিয়াকেই বোঝায়। অর্থাৎ কোন উদ্দেশ্য নির্ভর কার্য-পরিচালনার জন্য চাহিদা অনুযায়ী প্রয়োজনীয় অর্থের যোগান দিয়ে ব্যয় নির্বাহ করার যথাযথ প্রক্রিয়াকেই অর্থায়ন বা Financing বলা হয়। একে আবার কোন কোন ক্ষেত্রে কার্য পরিচালনার জন্য তহবিল ব্যবস্থাপনা হিসেবে অভিহিত করা হয়।

স্বাভাবিক চেতনায় বলা যায় দেশে প্রতিষ্ঠিত সকল সরকারি বিশ্ববিদ্যালয় সরকারি ভাবে প্রতিষ্ঠিত। কাজেই সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থায়ন বলতে সরকারি ব্যবস্থাপনায় এর যাবতীয় প্রয়োজনীয় অর্থের যোগান দিয়ে যথার্থই ব্যয় নির্বাহ করে উচ্চশিক্ষা কার্যক্রম অব্যাহত রাখার প্রক্রিয়াকেই বোঝানো হয়। অর্থাৎ সরকারি উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠান তথা বিশ্ববিদ্যালয় পরিচালনার জন্য সরকারি তহবিল হতে প্রয়োজনীয় অর্থ সরবরাহ করে থাকে। যেমন–

ক. রাজস্ব বাজেট (Revenue Budget);
খ. উন্নয়ন বাজেট (Development Budget)।

সরকারি উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠান তথা বিশ্ববিদ্যালয় পরিচালনায় সরকারিভাবে আয় ব্যয় পরিকল্পনা বাস্তবায়নের জন্য সরকারের রাজস্ব হতে বরাদ্দ ব্যয় নির্বাহই হল রাজস্ব বাজেট। অন্যদিকে অভ্যন্তরীণ সম্পদ এবং বৈদেশিক সাহায্যের উপর ভিত্তি করে সরকারিভাবে সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা কার্যক্রমের উন্নয়নের জন্য উন্নয়ন বাজেট প্রণয়ন করা হয়।

সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে আয়ের উৎস

সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের আয়ের উৎস সরকারি এবং বেসরকারি উভয় ক্ষেত্রেই প্রবর্তিত। উভয় ধরনের ক্ষেত্র হতে প্রদত্ত আয় দ্বারা সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের যাবতীয় শিক্ষা এবং শিক্ষা সংশ্লিষ্ট কার্যক্রম পরিচালিত হয়। খাত অনুযায়ী সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের আয়ের উৎসকে প্রধানত নিচের চেতনায় শ্রেণীবিভাগ করা যায়। যেমন–

ক. সরকারি উৎস: সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের ব্যয় নির্বাহের প্রধান উৎস হল সরকারি রাজস্ব বাজেট অথবা উন্নয়ন বাজেট অথবা উন্নয়ন বাজেটের প্রদত্ত অর্থ। রাজস্ব বাজেটের অর্থ সরকার তার রাজস্ব আয় হতে নির্বাহ করে থাকে। অন্যদিকে উন্নয়ন বাজেটের অংশ সরকার তার অভ্যন্তরীণ সম্পদ এবং বৈদেশিক সাহার্য ও অনুদান হতে প্রদান করে থাকে। এছাড়া শিক্ষার উন্নয়নের তাগিদে সরকার মাঝে মধ্যে সম্পূরক বাজেট এবং সংশোধিত বাজেট দিয়ে থাকে। সরকারি উৎস হতে প্রদত্ত অর্থ সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষক, কর্মকর্তা, কর্মচারীর বেতন ভাতা প্রদানে এবং শিক্ষা গবেষণা, বৃত্তি, উপবৃত্তি, পরিবহণ, আবাসন উন্নয়ন ও স্বাস্থ্য সেবা প্রদানের ব্যয় হয়ে থাকে।

খ. বেসরকারি উৎস: সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে আয়ের বেসরকারি উৎস বলতে সরকার প্রদানকৃত অর্থের বাইরে ব্যক্তিগত অনুদান, অভ্যন্তরীণ আয়, সংগঠন সংস্থা বা দেশ জাতিকর্তৃক প্রদত্ত অর্থগত আয়কেই বোঝানো হয়। সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে আয়ের বেসরকারি উৎসসমূহকে প্রধানত আরো চারটি ভাগে ভাগ করে বর্ণনা করা যায়। যেমন–

১. ব্যক্তিগত অনুদান

- ধনাঢ্য ব্যক্তির সাময়িক অর্থ অনুদান;
- অভিভাবকদের ডোনেশন;
- পিতা মাতার প্রদত্ত অনুদান:

- রাষ্ট্রীয় মহামান্য ব্যক্তিবর্গের অনুদান;
- ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার এবং শিক্ষক প্রদত্ত অনুদান।

২. সংস্থা/সংগঠন প্রদত্ত অনুদান

- এলাকাবাসী কর্তৃক প্রদত্ত চাঁদা;
- শিক্ষক সমিতি কর্তৃক প্রদত্ত অনুদান;
- শিক্ষক অভিভাবক সমিকি কর্তৃক অনুদান;
- প্রাক্তন ছাত্র/শিক্ষক সমিতি কর্তৃক অনুদান;
- বিভিন্ন NGO কর্তৃক প্রদত্ত আর্থিক সাহায্য;
- ইউনিয়ন, পৌরসভা বা জেলা পরিষদ কর্তৃক অনুদান;
- বিভিন্ন ক্রীড়া সংস্থা কর্তৃক প্রদত্ত অর্থ;
- স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠান কর্তৃক প্রদত্ত অর্থ;
- বিভিন্ন ব্যাংক, বীমা প্রতিষ্ঠান কর্তৃক প্রদত্ত সাহায্য;
- সংস্থা হতে সাময়িক গৃহীত অর্থ ঋণ।

৩. বৈদেশিক সাহায্য

- আন্তর্জাতিক সংস্থার অনুদান;
- বৈদেশিক উন্নয়ন সংস্থার অনুদান;
- বৈদেশিক সেবা সংস্থার অনুদান;
- আন্তর্জাতিক ধনাঢ্য ব্যক্তির অনুদান;
- জাতিসংঘের বিভিন্ন অঙ্গসংগঠনের আর্থিক সাহায্য;
- উন্নয়নমূলক কাজের জন্য আর্থিক চাঁদা সংগ্রহ;
- গ্রন্থাগার, গবেষণাগার এবং চিকিৎসা সেবার জন্য অনুদান;
- শিক্ষণ–শিখন সামগ্রি বাবদ বৈদেশিক সাহায্য;
- পুরষ্কার, গবেষণা বৃত্তি কিংবা উচ্চতর স্কলারশীপের জন্য বৈদেশিক বরাদ্দ ইত্যাদি।

৪. প্রতিষ্ঠানের নিজস্ব/অভ্যন্তরীণ উৎসগত আয়

- শিক্ষার্থীর ভর্তি ও রেজিস্ট্রেশন ফি;
- শিক্ষার্থীর বেতন;
- নিজস্ব জমি বা ভূসম্পত্তি হতে আয়;
- নিজস্ব ভবন, দোকান ও মার্কেট ভাড়া বাবদ আয়;
- পুকুর, ঘাট,মাঠ এবং হাট ইজারা বাবদ আয়;
- মেলা বা সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান বাবদ আয়;
- টিফিন, ড্রেস, পরিচর্যা ফি বাবদ আয়;
- পরিত্যক্ত আসবাবপত্র বিক্রয় লব্ধ আয়;
- বিজ্ঞান প্রদর্শনী বাবদ আয়;
- সঞ্চিতি সম্পদের বিনিয়োগকৃত আয়;
- প্রাতিষ্ঠানিক পর্যায়ে চিত্র প্রদর্শনী বাবদ আয়;

- পুরানো এবং অকেজো কাগজপত্র বিক্রয় বাবদ আয়;
- বাগান, ফলের গাছ ইজারা বাবদ আয়;
- পুরানো বৃক্ষ বিক্রয় বাবদ আয়;
- শিক্ষার্থী সনদ এবং মার্কশীট উত্তোলন ফি বাবদ আয়;
- গ্রন্থাগার ও গবেষণাগার ব্যবহার ফি;
- প্রাতিষ্ঠানিক প্রকাশনা বাবদ আয়;
- নিজস্ব যাবনবাহন ভাড়া বাবদ আয়;
- নিজস্ব প্রাতিষ্ঠানিক কার্যবাবদ বিনিয়োগকৃত আয়।

সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে অর্থায়ন প্রক্রিয়া

বাংলাদেশ বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশন ১৯৭৩ সনে জারিকৃত রাষ্ট্রপতির ১০ নম্বর আদেশের ৫ নং অনুচ্ছেদে বর্ণিত অর্পিত দায়িত্ব অনুসারে সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর আর্থিক প্রয়োজন নির্ধারণ করে থাকে। এ জন্য বিশ্ববিদ্যালয়গুলো থেকে প্রাপ্ত প্রস্তাবিত বাজেট ও অন্যান্য আর্থিক চাহিদা পরীক্ষা করে বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর জন্য অর্থ মঞ্জুরির প্রস্তাব ও চাহিদা মঞ্জুরি কমিশন কর্তৃক সরকারের নিকট পেশ করা হয়। শিক্ষা মন্ত্রণালয় ও অর্থ মন্ত্রণালয় কমিশন কর্তৃক পেশকৃত প্রস্তাব ও চাহিদা এবং সরকারের আর্থিক সামর্থ বিবেচনা রেখে বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর জন্য কমিশনের অনুকূলে থোক অর্থ মঞ্জুরি (Lump Sum Grant) বরাদ্দ করে থাকে। উল্লেখ্য, সরকার বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য অর্থ বরাদ্দ করে না।

বিশ্ববিদ্যালয়ে অর্থ মঞ্জুরির ধাপসমূহ

সরকার কর্তৃক বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর জন্য অর্থ মঞ্জুরি প্রক্রিয়ার ধাপগুলো নিম্নে বর্ণনা করা হল:

১. বাংলাদেশ বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশন (ইউজিসি)-এর নিকট পেশকৃত বিশ্ববিদ্যালয়ের বাজেট পরীক্ষা নিরীক্ষা করে বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর আর্থিক প্রয়োজন মূল্যায়ন করে।
২. ইউজিসি বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর বাজেট মূল্যায়ন করার পর শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের নিকট দাখিল করে। শিক্ষা মন্ত্রণালয় আবার সরকারের আর্থিক সামর্থ ও বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর চাহিদার নিরীখে বাজেট পুনঃ মূল্যায়ন করে থাকে। এ সময় শিক্ষা মন্ত্রণালয় প্রস্তাবিত বাজেটের অর্থ বরাদ্দের চূড়ান্ত করার জন্য অর্থ মন্ত্রণালয়ের নিকট পেশ করে।
৩. অর্থ মন্ত্রণালয় এর পর বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশন ও শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের সাথে আলাপ আলোচনার মাধ্যমে বাজেট বরাদ্দ চূড়ান্ত করে মঞ্জুরি কমিশনকে থোক অর্থ বরাদ্দ করে থাকে।
৪. এইভাবে চূড়ান্ত বাজেট জাতীয় বাজেট বইয়ের শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের বাজেট শিরোনামের অধীনে প্রকাশ করা হয়।
৫. শিক্ষা মন্ত্রণালয় বিশ্ববিদ্যালয়গুলোকে বাজেটের অর্থ বন্টনের জন্য সরকারি আদেশ জারি করে।
৬. সবশেষ, বিশ্ববিদ্যালয়গুলো তাদের নির্ধারিত বাজেটে বরাদ্দ অর্থ ৪/৫ কিস্তিতে উত্তোলন করে।

সরকারি কলেজের জন্য সরকারি অর্থ মঞ্জুরি প্রক্রিয়া

সরকারি কলেজগুলোকে আর্থিক শৃঙ্খলা পুরোপুরি মেনে চলতে হয়। কলেজের শিক্ষক কর্মকর্তা কর্মচারীদের বেতন-ভাতাদি এবং বিবিধ খরচের জন্য বাজেট প্রণয়ন করে মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা অধিদপ্তরে পেশ করতে হয়। মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক অধিদপ্তর সকল কলেজের বাজেটগুলো একত্র করে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ে দাখিল করে। শিক্ষা মন্ত্রণালয় কর্তৃক শেষবারের মত পরীক্ষা নিরীক্ষার পর জাতীয় সংসদের বাজেট অধিবেশনে অনুমোদন

প্রাপ্তির মাধ্যমে জাতীয় বাজেট বইয়ে লিপিবদ্ধ হয়। অতঃপর অন্যান্য সরকারি বিভাগের মত কলেজের কর্মকর্তা ও কর্মচারিগণ তাদের বেতন ভাতাদি মহা হিসাব রক্ষণ অফিস (শিক্ষা) হতে উত্তোলন করে থাকেন।

আনুসঙ্গিক খরচের জন্য অর্থ ব্যবহার

আনুসঙ্গিক খরচ বলতে মনোহারী দ্রব্যাদি এবং দৈনন্দিন অন্যান্য খরচকে বুঝায়। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোর জন্য সরকারি বাজেটে তেমন কোন বিশেষ অর্থ বরাদ্দ থাকে না, অবশ্য, বিবিধ খরচের খাত হতে এসব খরচ মেটানোর ব্যবস্থার কথা বলা আছে। বিবিধ খরচের খাত ছাড়া সরকারি কলেজগুলো ঢাকায় অবস্থিত কেন্দ্রীয় সাপ্লাই ডিপো থেকে কাগজ, কালি এবং খাম ইত্যাদি পেয়ে থাকে। আনুসাঙ্গিক ও বিবিধ খরচের জন্য আগে থেকেই সরকারের নিকট রিকিউজিশন পেশ করতে হয়। কলেজের আকার অনুযায়ী ফাণ্ড বরাদ্দ করা হয়।

কলেজের উন্নয়নের জন্য অর্থ ব্যবহার

কলেজ বিল্ডিং এর আকার বৃদ্ধি/উন্নয়ন, ল্যাবরেটরির সুবিধা বৃদ্ধি, হোস্টেল সুবিধাদি ইত্যাদির উন্নয়নের জন্য উন্নয়ন বাজেটে বরাদ্দ অর্থ হতে খরচ করা হয়। এ ধরণের উন্নয়ন কর্মকাণ্ডের পরিকল্পনা ও বাস্তবায়ন কার্যাদি DSHE-এর প্লানিং বিভাগের নিয়ন্ত্রণ ও ব্যবস্থাপনায় সম্পন্ন হয়ে থাকে।

কলেজ শিক্ষার অর্থায়ন ব্যবহার উন্নতির জন্য উচ্চশিক্ষায় অর্থায়নের আন্তর্জাতিক অভিজ্ঞতার নিরীখে অতিরিক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করা বাঞ্ছনীয়। এই প্রসঙ্গে নিম্নে কিছু সুপারিশ উল্লেখ করা হল:

- কলেজের স্থাবর সম্পত্তির উপযুক্ত ব্যবহার করা যেমন, বাংলাদেশের অনেক সরকারি কলেজের যথেষ্ট জমি রয়েছে। এ জমিতে আধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহার করে চাষাবাদের মাধ্যমে ফসল উৎপাদন ও কলেজের পুকুরে মাছ চাষের ব্যবস্থা গ্রহণ করা যায়।
- ব্যবসার ক্ষেত্রে বিনিয়োগের পরামর্শ দানের মাধ্যমে আয় অর্জন করা যায়। এ ব্যাপারে কলেজের ব্যবসায় শিক্ষা শাখা অবদান রাখতে পারে।
- কলেজে ক্যাফেটরিয়া স্থাপন বা পুরাতন ক্যাফেটরিয়ার ব্যবস্থাপনার উন্নতির মাধ্যমে আয় অর্জন করা যায়।

বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষার্থী কর্তৃক প্রদত্ত বেতন ও আনুসাঙ্গিক ফি দ্বারা অর্থায়নের প্রধান উৎস হিসেবে গণ্য করা হয়। শিক্ষার্থীদের নিকট থেকে আদায়কৃত অর্থ দ্বারা বিশ্ববিদ্যালয় পরিচালিত করে থাকে। এতে সরকারি কোন অর্থ ব্যয় বা বরাদ্দ করে না। বেসরকারি কলেজ ও মাদরাসার সরকারি অংশ (MPO) ও নিজস্ব আয় দ্বারা অর্থায়নের ব্যবস্থা করে থাকে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ৪.৩

ক. বহু নির্বাচনী প্রশ্ন

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন।

১. কত সালে বিশ্ববিদ্যালয় আইন দ্বারা প্রশাসন ও ব্যবস্থাপনা পরিচালিত হয়ে আসছে?
   ক. ১৯৭৩ খ্রীঃ
   খ. ১৯৭৪ খ্রীঃ
   গ. ১৯৭৫ খ্রীঃ
   ঘ. ১৯৭৬ খ্রীঃ

২, সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়সমূহকে অর্থ প্রদান করে–
   ক. সরাসরি ভাবে
   খ. মঞ্জুরি কমিশনের মাধ্যমে
   গ. শিক্ষা বোর্ডের মাধ্যমে
   ঘ. জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের মাধ্যমে

৩. বিশ্ববিদ্যালয়সমূহ কয় কিস্তিতে অর্থ উত্তোলন করে–
   ক. দুই কিস্তিতে
   খ. তিন কিস্তিতে
   গ. চার কিস্তিতে
   ঘ. পাঁচ কিস্তিতে

৪. সরকারি কলেজের অর্থায়নের প্রধান উৎস–
   ক. ছাত্র বেতন
   খ. বৈদেশিক সাহায্য
   গ. সরকারি অর্থ মঞ্জুরি
   ঘ. বেসরকারি সংস্থা

উত্তরমালাঃ ১. ক, ২. খ, ৩. গ. ৪. গ

খ. সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন

১. উপাচার্যের ব্যবস্থাপনা কার্যক্রমের বিবরণ দিন।
২. সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে অর্থ উৎসসমূহ লিখুন।
৩. সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে অর্থ মঞ্জুরীর ধাপসমূহ লিখুন।

গ. রচনামূলক প্রশ্ন

১. সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রশাসন ও ব্যবস্থাপনার কার্যক্রম ব্যাখ্যা করুন।
২. বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় পরিচালনায় উপাচার্যের ভূমিকা বর্ণনা করুন।
৩. সরকারি ও বেসরকারি কলেজ পরিচালনায় শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের ভূমিকা বর্ণনা করুন।

পাঠ ৪.৪: বাংলাদেশ বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশন

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি–

- ইউজিসি গঠনের রূপরেখা তৈরি করতে পারবেন।
- ইউজিসির দায়িত্ব ও কর্তব্য বর্ণনা করতে পারবেন।
- ইউজিসির কর্ম-বিভাজন বর্ণনা করতে পারবেন।
- উচ্চশিক্ষার গুণগত মান উন্নয়নে ইউজিসির ভূমিকা ব্যাখ্যা করতে পারবেন।

১৯৭৩ সালের রাষ্ট্রপতির ১০ নম্বর আদেশ অনুসারে 'বাংলাদেশ বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশন' প্রতিষ্ঠিত হয়। এই আদেশের ৪(১) নম্বর অনুচ্ছেদ এবং ১৯৯৮ সনের সংশোধনী মোতাবেক ১ জন চেয়ারম্যান, ৫ জন পূর্ণকালীন সদস্য এবং ৯ জন খন্ডকালীন সদস্য যথা: বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের উপাচার্যবৃন্দের মধ্য থেকে পর্যায়ক্রমে ৩ জন এবং বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের অধ্যাপক ও ডিনদের মধ্য থেকে প্রতিনিধিত্বকারী বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক মনোনীত সদস্য পর্যায়ক্রমে ৩ জন, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক মনোনীত সদস্য ৩ জন (শিক্ষা সচিব, অর্থ মন্ত্রণালয়ের সচিব পর্যায়ের এক জন প্রতিনিধি ও পরিকল্পনা কমিশনের এক জন সদস্য) সমন্বয়ে কমিশন গঠিত হয়। এই কমিশন উল্লিখিত আদেশের ১২ নম্বর ধারামতে কমিশন ও দেশের বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের বার্ষিক কার্যক্রমের তথ্য-উপাত্ত সংবলিত পরিসংখ্যানভিত্তিক প্রতিবেদন সরকারের মাধ্যমে মহান জাতীয় সংসদে উপস্থাপনের জন্য দায়বদ্ধ।

কমিশনের ভূমিকা ও দায়িত্ব

১৯৭৩ সালের রাষ্ট্রপতির ১০ নম্বর আদেশ অনুসারে 'বাংলাদেশ বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশন' প্রতিষ্ঠিত হয়। এই আদেশ অনুসারে কমিশনের ভূমিকা এবং দায়িত্ব নিম্নরূপ–

ক. বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ে শিক্ষার চাহিদা নিরূপণ এবং উচ্চশিক্ষার উন্নয়নের লক্ষে সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনা প্রণয়ন করা;
খ. বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের আর্থিক চাহিদা নির্ধারণ করা;
গ. সরকারের নিকট থেকে তহবিল গ্রহণ করা এবং বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের রক্ষণাবেক্ষণ ও উন্নয়ন খাতে চাহিদা ও সার্বিক প্রয়োজনের ভিত্তিতে অনুদান বরাদ্দ করা;
ঘ. বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের বিভাগ, ইন্সটিটিউট ও অন্যান্য অধিভূক্ত প্রতিষ্ঠানসমূহের উন্নয়নমূলক কার্যক্রম মূল্যায়ন করা;
ঙ. বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের সকল প্রকার উন্নয়নমূলক পরিকল্পনা পরীক্ষার পর সুপারিশ পেশ করা;
চ. বিশ্ববিদ্যালয় ও উচ্চশিক্ষা-সংক্রান্ত পরিসংখ্যান ও অন্যান্য তথ্যাবলি সংগ্রহ করা;
ছ. নতুন বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন এবং বর্তমান বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের সম্প্রসারণ বিষয়ে সরকারকে পরামর্শ দান করা;
জ. কলেজসমূহকে উপযুক্ত বিবেচনা সাপেক্ষে বিশেষ ডিগ্রি মঞ্জুরীর ক্ষমতা-প্রদান সম্পর্কিত প্রস্তাব সম্বন্ধে সরকারকে পরামর্শ দান করা;
ঝ. সরকার কিংবা কোন আইন বলে প্রদত্ত যে কোন ক্ষমতা প্রয়োগ বা দায়িত্ব পালন করা; এবং

ঞ. প্রয়োজনবোধে বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের যে কোন কার্যক্রমের মূল্যায়ন এবং বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের চাহিদা নিরূপণের জন্য কমিশন অথবা কমিশন অথবা কমিশন কর্তৃক প্রেরিত বিশেষজ্ঞদল কর্তৃক বিশ্ববিদ্যালয় পরিদর্শন করা।

এতদ্ব্যতীত, বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের উন্নতি ও রক্ষণাবেক্ষন, উচ্চশিক্ষা ও গবেষণা উন্নয়ন এবং কমিশনের ওপর ন্যস্ত দায়িত্ব পালনের জন্য প্রয়োজনীয় অর্থ ১৯৭৩ সালের এই আদেশ অনুসারে সরকার কমিশনের অনুকূলে বরাদ্দ করে থাকে।

কমিশনের কর্মকর্তাবৃন্দ

২০১৫ সনে কমিশনে কর্মরত প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণির কর্মকর্তা ছিল ১২৮ জন, তৃতীয় শ্রেণির কর্মচারী ছিল ৬০ জন এবং চতুর্থ শ্রেণির কর্মচারীর সংখ্যা ছিল ৮০ জন। উল্লেখিত সময়ে কমিশনে মোট ২৬৮ জন কর্মকর্তা ও কর্মচারী কর্মরত ছিলেন।

কর্মবিভাজন

কমিশনের চেয়ারম্যানের দপ্তর ও পূর্ণকালীন সদস্যবৃন্দের দপ্তর ছাড়াও কমিশনের কার্যক্রম আটটি বিভাগের মাধ্যমে পরিচালিত হয়ে থাকে। বিভাগগুলো হচ্ছে: (ক) প্রশাসন বিভাগ, (খ) অর্থ ও হিসাব বিভাগ, (গ) পরিকল্পনা ও উন্নয়ন বিভাগ, (ঘ) রিসার্চ সাপোর্ট অ্যান্ড পাবলিকেশন বিভাগ, (ঙ) বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় বিভাগ, (চ) সরকারি বিশ্ববিদ্যালয় ম্যানেজমেন্ট বিভাগ, (ছ) ইনফরমেশন ম্যানেজমেন্ট, কমিউনিকেশন অ্যান্ড ট্রেনিং বিভাগ, (জ) স্ট্রাটেজিক প্ল্যানিং, কোয়ালিটি এসুরেন্স এন্ড রাইট টু ইনফরমেশন বিভাগ। এগুলোর সংক্ষিপ্ত বিবরণ নিচে দেয়া হলো:

প্রশাসন বিভাগ: প্রশাসন বিভাগ কমিশনের সভা, উপাচর্যবৃন্দের সভা, বিধিবিধান, নিয়োগ, পদোন্নতি, ডিগ্রি সমতা বিধান, জাতীয় অধ্যাপকবৃন্দের সম্মানী প্রদান, ইউজিসি এম.ফিল ও পিএইচ.ডি ফেলোশিপ, কমনওয়েলথ, ইউনেস্কো ও সার্ক ফেলোশিপসহ যাবতীয় প্রশাসনিক কার্যাবলি সম্পাদন করে থাকে। প্রশাসন বিভাগের বর্তমান বিভাগীয় প্রধান হলেন কমিশনের সচিব।

পরিকল্পনা ও উন্নয়ন বিভাগ: বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের প্রতিবছরে পৌনঃপুনিক বাজেট প্রস্তাব সরেজমিনে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে প্রয়োজনীয় অর্থ বরাদ্দের বিষয়ে শিক্ষা ও অর্থ মন্ত্রণালয়ের সুপারিশ পেশ এবং যথাসময়ে সরকারি তহবিল থেকে অর্থ ছাড় করিয়ে পুনরায় বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের মধ্যে যথাযথভাবে বন্টন করা এই বিভাগের মূখ্য কাজ। উল্লেখ্য যে, বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের পৌন:পুনিক বাজেটের শতকরা প্রায় ৯০ ভাগ অর্থ সরকারি তহবিল থেকে পাওয়া যায়। এছাড়াও এই বিভাগ থেকে কমিশনের আর্থিক ব্যবস্থাপনাও নিয়ন্ত্রিত হয়ে থাকে। এই বিভাগের হিসাব, বাজেট এবং অডিট নামে তিনটি শাখা আছে। একজন পরিচালক অর্থ ও হিসাব বিভাগের বিভাগীয় প্রধানের দায়িত্ব পালন করেন।

অর্থ ও হিসাব বিভাগ: বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা, বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনা, কারিগরি সহায়তা পরিকল্পনা এবং সরকারি নীতিমালার সাথে সামঞ্জস্য রেখে বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের সার্বিক উন্নয়নমূলক পরিকল্পনা প্রণয়ন এবং তা বাস্তবায়নের বিষয়ে সরকারি কোষাগার থেকে অর্থ ছাড় করে সংশ্লিষ্ট বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রেরণ করা এই বিভাগের মূখ্য দায়িত্ব। উন্নয়নমূলক কার্যাবলি সুষ্ঠুভাবে সম্পাদন হচ্ছে কি-না সে সম্পর্কে সরেজমিনে পরীক্ষা, সংশ্লিষ্ট বিশ্ববিদ্যালয়সমূহ থেকে প্রতিবেদন সংগ্রহ, অগ্রগতি পর্যালোচনা এবং এই বিষয়ে শিক্ষা মন্ত্রণালয় ও পরিকল্পনা কমিশনের সাথে যোগাযোগ রক্ষা ও পরামর্শ প্রদান করা এই বিভাগের অন্যতম দায়িত্ব। পরিকল্পনা ও উন্নয়ন বিভাগের প্রধান হলেন একজন পরিচালক।

রিসার্চ সাপোর্ট অ্যান্ড পাবলিকেশন বিভাগঃ কমিশনের গবেষণা সহায়তা প্রকাশনা বিভাগ বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের একাডেমিক কার্যক্রম বিশেষত বিশ্ববিদ্যালয়সমূহে গবেষণার ভিত্তি দৃঢ় ও সংহত করার উদ্দেশ্যে প্রতিষ্ঠা করা হয়। মূলত এই বিভাগ কলা ও মানবিক, সামাজিক বিজ্ঞান, বিজ্ঞান ও কারিগরি, এই তিনটি শাখায় দেশের বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের শিক্ষকদের গবেষণা কার্যক্রমে বার্ষিক গবেষণা প্রকল্প প্রদানের মাধ্যমে নিয়োজিত রাখে। একে একাডেমিক স্টাফ ডেভেলপমেন্ট রিসার্চ প্রজেক্ট বলা হয়। এছাড়াও আগে সিনিয়র রিসার্চ ফেলোশিপের আওতায় জাতীয় গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে গবেষণা করা হতো। বর্তমানে এই শাখায় গবেষণা সহায়ক তহবিল ও শিক্ষা সহায়ক তহবিলের মাধ্যমে গবেষণার কাজে সহায়তা দানের লক্ষ্যে গবেষণার উপাত্ত সংগ্রহ, যন্ত্রাংশ খরিদ, বিদেশে প্রকাশিত দুস্প্রাপ্য গ্রন্থ বা গবেষণাপত্রের মাইক্রো ফিল্ম/ফটোকপি সংগ্রহ ইত্যাদির জন্য অনুদান দেয়া হয়ে থাকে। এই বিভাগের অন্তর্গত প্রকাশনা ও তথ্য শাখা কর্তৃক কমিশন এবং বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের বার্ষিক কার্যক্রম এবং তথ্য ও পরিসংখ্যান বার্ষিক প্রতিবেদন আকারে কমিশন আদেশ ১৯৭৩ এর ১২ ধারা মতে জাতীয় সংসদে উপস্থাপন করা হয়ে থাকে। এছাড়াও গবেষণা প্রতিবেদন ও উচ্চস্তরের মৌলিক পাঠ্যপুস্তক প্রকাশের কাজও এই শাখা থেকে করা হয়ে থাকে। এই বিভাগের অধীন একটি সেন্ট্রাল রেফারেন্স লাইব্রেরিও আছে। একজন পরিচালক বিভাগের বিভাগীয় প্রধানের দায়িত্ব পালন করেন।

বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় বিভাগঃ দেশের বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন সংক্রান্ত কার্যাবলি ও মান নিয়ন্ত্রণ করার জন্য ২০০৬ সালে ১০৮তম কমিশন সভার সুপারিশক্রমে বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় বিভাগ খোলা হয়। বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনসহ সকল কার্যক্রম ও বিভাগের মাধ্যমে সম্পাদিত হয়ে থাকে।

ইনফরমেশন ম্যানেজমেন্ট, কমিউনিকেশন অ্যান্ড ট্রেনিং বিভাগঃ বাংলাদেশ বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশন কর্তৃক দেশের বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের গবেষণাগারে ব্যবহৃত মূল্যবান বৈজ্ঞানিক যন্ত্রপাতি যথাযথ মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণের জন্য এবং বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের ল্যাবরেটরি কর্মীদের প্রশিক্ষণের উদ্দেশ্যে ১৯৭৫ সালে ক্যামব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের সহযোগিতায় ইন্সটিটিউট অভ সায়েন্টিফিক ইন্সট্রুমেন্টেশন প্রতিষ্ঠা করা হয়। ২০০৬ সালে ১১০তম কমিশন সভার সিদ্ধান্তক্রমে আইএসআইকে পূর্ণ মর্যাদায় টিআইভি বিভাগ চালু করা হয়। বর্তমানে এর নাম পরিবর্তন করে আইএমসিটি বিভাগ করা হয়েছে। এ বিভাগের মাধ্যমে কমিশনের কর্মকর্তা-কর্মচারী ও বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের শিক্ষকদের জন্য বহুমুখী চাহিদার নিরিখে গুণগতমানসম্পন্ন প্রযুক্তিমুখী স্বল্প ও দীর্ঘমেয়াদী বিভিন্ন প্রশিক্ষণ কোর্স পরিচালনা করা হয়।

স্ট্রাটেজিক প্ল্যানিং, কোয়ালিটি এসিওরেন্স অ্যান্ড রাইট টু ইনফরমেশন বিভাগঃ এ বিভাগটি নতুনভাবে চালু করা হয়েছে। এ বিভাগের মাধ্যমে বিশ্ববিদ্যালয়সমূহে পরিচালিত বিভিন্ন কোর্স/কারিকুলাম-এর গুণগতমান নিরূপণ, বিশ্বমানের শিক্ষা নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে স্বল্পমেয়াদি ও দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনা প্রণয়ন করে থাকে।

সরকারি বিশ্ববিদ্যালয় ম্যানেজমেন্ট বিভাগঃ উক্ত বিভাগের মাধ্যমে সকল সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের ম্যানেজমেন্ট, একাডেমিক এবং প্রশাসনিক কর্মকান্ড সম্পাদিত হয়ে থাকে।

বাংলাদেশে উচ্চশিক্ষা পরিচালনার জন্য দুই ধরনের প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠিত আছে। বিশ্ববিদ্যালয় এবং কলেজ। এ দুই ধরনের প্রতিষ্ঠানের প্রশাসনিক ব্যবস্থাপনা ভিন্নতর। এদের মাঝে আবার রয়েছে সরকারি বিশ্ববিদ্যালয় ও কলেজ এবং বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় ও কলেজ। বিশ্ববিদ্যালয়গুলো জাতীয় সংসদে প্রণীত আইন দ্বারা পরিচালিত হয়। সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়গুলো স্বায়ত্তশাসিত নীতির উপর প্রতিষ্ঠিত যা ১৯৭৩ সালের অধ্যাদেশ মোতাবেক সংবিধিবদ্ধ। অন্যদিকে বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়গুলো ১৯৯২ সালের প্রণীত আইন এবং ১৯৯৭ সালের ও ২০০৫, ২০০৭ সালের সংশোধিত আইন দ্বারা পরিচালিত হয়ে আসছে। বাংলাদেশ বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশন বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর একাডেমিক কার্যক্রম ও আর্থিক অনুমোদন দিয়ে থাকে। সবগুলো সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের

আর্থিক চাহিদা ও একাডেমিক কার্যক্রম নির্ধারণ করা টএঈ-এর মূখ্য দায়িত্ব। বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের আর্থিক এবং একাডেমিক তদারকি করে UGC.

শিক্ষার মান উন্নয়নে ইউজিসির ভূমিকা

গবেষণা, স্কলারশিপ ও ফেলোশিপ

বাংলাদেশ বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশনের গবেষণা সহায়ক ও প্রকাশনা বিভাগ দেশের সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের শিক্ষকবৃন্দের গবেষণা কাজে সহায়তা দানের লক্ষে একাডেমিক স্টাফ ডেভেলপমেন্ট রিসার্চের আওতায় গবেষণা কার্যক্রম পরিচালনা করে আসছে। উক্ত গবেষণা কার্যক্রম কলা, মানবিক ও সামাজিক বিজ্ঞান শাখা এবং বিজ্ঞান ও কারিগরি শাখার মাধ্যমে পরিচালনা করা হয়। বিজ্ঞান ও কারিগরি শাখার অধীনে আরো ৬টি উপ-শাখা রয়েছে। উপশাখাগুলো: ভৌত বিজ্ঞান, রসায়ন বিজ্ঞান, জীব বিজ্ঞান, কৃষি বিজ্ঞান, প্রকৌশল বিজ্ঞান ও চিকিৎসা বিজ্ঞান। এছাড়া শিক্ষকদের আন্তর্জাতিক সভা-সম্মেলন ও প্রশিক্ষণ কোর্সে যোগদান এবং গবেষণা কাজে তথ্য সংগ্রহ এবং এম.ফিল ও পিএইচ.ডি ফেলোদের অভিসন্দর্ভ তৈরি ও তথ্য সংগ্রহের কাজে আর্থিক সহায়তা দানের জন্য কমিশনের গবেষণা সহায়ক কার্যক্রম সামাজিক বিজ্ঞান গবেষণা শাখার মাধ্যমে পরিচালিত হয়ে আসছে। বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষকবৃন্দের মৌলিক গবেষণায় উৎসাহ ও স্বীকৃতিদানের লক্ষে কমিশনের গবেষণা সহায়ক ও প্রকাশনা বিভাগের মাধ্যমে ইউজিসি এওয়ার্ড প্রদান কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে।

গবেষণা সহায়ক ও প্রকাশনা বিভাগের অধীনে আরো দুটি শাখা আছে যথা: গ্রন্থাগার ও ডকুমেন্টেশন শাখা এবং তথ্য ও প্রকাশনা শাখা। তথ্য ও প্রকাশনা শাখা থেকে ১৯৭৩ সালের রাষ্ট্রপতির ১০ নম্বর আদেশের ১২ নম্বর অনুচ্ছেদ মোতাবেক দেশের বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের তথ্য ও পরিসংখ্যান নিয়ে প্রস্তুতকৃত বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশনের বার্ষিক প্রতিবেদন সরকারের মাধ্যমে জাতীয় সংসদে উপস্থাপন করা হয়। এছাড়াও উক্ত শাখা থেকে উচ্চস্তরের গবেষণামূলক মৌলিক গ্রন্থসহ অন্যান্য প্রকাশনা প্রকাশিত হয়ে আসছে। ১৯৯৯ সালে 'বিমক পুস্তক প্রকাশনা তহবিল' গঠন করে দেশের বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের স্নাতক, স্নাতক সম্মান ও স্নাতকোত্তর পাঠক্রম ও পাঠ্যসূচি অনুযায়ী পাঠ্যপুস্তক, রেফারেন্স ও অনুবাদগ্রন্থ প্রকাশ করে আসছে। কমিশন গ্রন্থাগার কমিশনের সকল প্রকাশনা ও গবেষণার সংরক্ষণাগার এবং গবেষকদের রেফারেন্স লাইব্রেরি হিসেবে পরিচালিত হয়ে আসছে।

এছাড়া কমিশনে প্রশাসন বিভাগের জনসংযোগ শাখা নিয়মিত ত্রৈমাসিক ইউজিসি বুলেটিন ও ডায়েরি প্রকাশ করে আসছে। কমিশনের সকল তথ্য সম্প্রচার এবং আন্ত ও বহি:জনসংযোগের কাজ এ শাখার মাধ্যমে করা হয়ে থাকে। ২০১১ সাল হতে কমিশনের শাখা গবেষণা সহায়ক ও প্রকাশনা বিভাগের অধীনে পরিচালিত হচ্ছে। পূর্বে এ শাখা প্রশাসন বিভাগের অধীনে ছিল। বৃত্তি শাখার মাধ্যমে স্কলারশীপ ও ফেলোশিপসমূহ প্রদান করা হয়ে থাকে। তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো ইউজিসি পিএইচ.ডি ফেলোশিপ, ইউজিসি এম.ফিল ফেলোশিপ, ইউজিসি মেধাবৃত্তি, জনতা ব্যাংক মেধাবৃত্তি, ইউজিসি প্রফেসরশিপ, প্রধানমন্ত্রী স্বর্ণপদক, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ফেলোশিপ, জেএসপিএস ইত্যাদি। একই সময় হতে ইন্টারন্যাশনাল কো-অপারেশন অ্যান্ড কোলাবরেশন (আইসিসি) নামে আরও একটি শাখা সরাসরি চেয়ারম্যান মহোদয়ের তত্ত্বাবধানে পরিচালিত হয়ে আসছে। এ শাখার মাধ্যমে কমনওয়েলথ স্কলারশিপ, কমনওয়েলথ একাডেমিক স্টাফ এওয়ার্ড, সার্ক চেয়ার ও স্কলাশিপ, জিএসপিএসসহ ইন্টারন্যাশনাল সম্পর্কীয় যাবতীয় কার্যক্রম পরিচালিত হচেছ। এছাড়া বিদেশ হতে অর্জিত ডিগ্রী বাংলাদেশের ডিগ্রীর সাথে সমতা বিধানে কার্যক্রম বৃত্তি শাখার মাধ্যমে সম্পন্ন করা হচ্ছে।

ইউজিসি লাইব্রেরি

১৯৭৩ সালে বাংলাদেশ বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশন গ্রন্থাগার প্রতিষ্ঠা করা হয়। প্রতিষ্ঠাকালে এই গ্রন্থাগারকে বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের সেন্ট্রাল রেফারেন্স লাইব্রেরি হিসেবে গড়ে তোলার পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছিল।

পরবর্তীকালে এই গ্রন্থাগারের মাধ্যমে দেশের সকল বিশ্ববিদ্যালয়ের ইউনিয়ন ক্যাটালগ ও কেন্দ্রীয় জার্নাল লাইব্রেরি হিসেবে গড়ে তোলার পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়। এর মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল– (১) কমিশনে কেন্দ্রিয়ভাবে রিসার্চ জার্নাল সংগ্রহ, সংরক্ষণ এবং বিতরণ প্রক্রিয়ার মাধ্যমে উচ্চশিক্ষা ও গবেষণাকে মানসম্পন্ন করা; (২) সকল বিশ্ববিদ্যালয়ের লাইব্রেরিসমূহের মধ্যে রিসোর্স শেয়ারিং করা; (৩) সকল বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষণা ও প্রকাশনের কেন্দ্রীয় সংরক্ষণাগার হিসেবে গড়ে তোলা ইত্যাদি। বর্তমানে ইউজিসি লাইব্রেরি কমিশনের কর্মকর্তা ও কর্মচারী, ইউজিসি রিসার্চ ফেলো, সার্ক ফেলো, গবেষকবৃন্দসহ দেশ/বিদেশের বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের শিক্ষক ও শিক্ষার্থীরা ব্যবহার করে থাকেন।

গ্রন্থাগারে বর্তমান সংগ্রহ সংখ্যা ১২,৭৩৭ কপি। তন্মধ্যে বই ১০,৪৩৭টি, গবেষণা সন্দর্ভের (এম.ফিল ও পিএইচ.ডি) সংখ্যা ৬২০টি, গবেষণা প্রতিবেদনের সংখ্যা ১,২১০টি, জার্নাল ৪৭০টি। ২০১৫ সালে বই ১৪টি, গবেষণা সন্দর্ভ ২২টি, গবেষণা প্রতিবেদন ৬৫টি এবং জার্নাল ১০টি সংগৃহীত হয়েছে। বই ও সাময়িকী বাবদ ব্যয় হয়েছে ৩,১৯,৫৯৯.০০ (তিন লক্ষ উনিশ হাজার পাঁচশত নিরানব্বই) টাকা। কমিশনের উদ্যোগে বাংলাদেশের সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের লাইব্রেরিতে Inter Library Network সৃষ্টি করার লক্ষ্যে Digital Library in the University Library শীর্ষক প্রকল্প বাস্তবায়ন প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।

প্রকাশনা ও তথ্য

১৯৭৩ সাল থেকে কমিশনের প্রকাশনা শাখা থেকে কমিশনের বার্ষিক প্রতিবেদন, Returns from the Universities এবং কিছু উচ্চস্তরের গবেষণা ও রেফারেন্স বই প্রকাশ করা হতো। পরবর্তীকালে বিশ্বব্যাংকের আর্থিক সহায়তা Business Management Education and Training Project, BMET প্রকল্পের আওতায় বাণিজ্য অনুষদের বিভিন্ন বিষয়ে ১১টি বই প্রকাশ করা হয়। অতঃপর ১৯৯৯ সালে "ইউজিসি পুস্তক প্রকাশনা তহবিল" গঠনের মাধ্যমে দেশের বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের স্নাতক, স্নাতক সম্মান ও স্নাতকোত্তর পর্যায়ের পাঠ্যক্রম ও পাঠ্যসূচি অনুযায়ী জ্ঞান-বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখায় উচ্চশিক্ষাস্তরে পাঠ্যপুস্তক, রেফারেন্স ও অনুবাদগ্রন্থসহ মৌলিক বিষয়ে গবেষণা বিষয়ক গ্রন্থ নিয়মিতভাবে প্রকাশিত হয়ে আসছে। উল্লেখিত তহবিলের আওতায় এ পর্যন্ত ১৭৬টি গ্রন্থ ও প্রকাশনা প্রকাশিত হয়েছে বর্তমানে এ ধারা অব্যাহত রয়েছে।

উচ্চশিক্ষা মানোন্নয়ন প্রকল্প

বাংলাদেশ বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশন ২০০৬ সালে ২০ বছর মেয়াদি (২০০৬-২০২৬) স্ট্র্যাটেজিক প্ল্যান প্রণয়ন করেছিলো। স্ট্র্যাটেজিক প্ল্যানের সুপারিশের ভিত্তিতে দেশের বিশ্ববিদ্যালয়সমূহ– (১) উচ্চশিক্ষার ক্ষেত্রে উদ্ভাবনী ও জবাবাবদিহিতামূলক কার্যক্রমের উৎসাহ প্রদান ও অর্থায়ন করা এবং (২) কারিগরি ও প্রাতিষ্ঠানিক দক্ষতা বৃদ্ধির মাধ্যমে উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহের মানসম্মত শিক্ষা ও গবেষণা কর্মের গুণগত মানোন্নয়ন করা। উপর্যুক্ত উদ্দেশ্য যথার্থ পরিবেশ (Enabling Environment) সৃষ্টির লক্ষ্যে ৬৮১ কোটি টাকা ব্যয়ে 'উচ্চশিক্ষা মানোন্নয়ন প্রকল্প' (Higher Education Quality Enhancement Project, (HEQEP) বাস্তবায়ন কার্যক্রম শুরু করা হয়। এ প্রকল্পটির বাস্তবায়ন কার্যক্রম ইউজিসি কর্তৃক পরিচালিত হচ্ছে। প্রকল্পটি হতে ইতোমধ্যেই মানসম্মত উচ্চশিক্ষা ও গবেষণার ক্ষেত্রে প্রকল্পের আওতাভূক্ত বিশ্ববিদ্যালয়সমূহ সুফল পেতে শুরু করেছে। এই প্রকল্পের আওতায় প্রকল্পের কর্মকাণ্ড ও উল্লেখযোগ্য অর্জনসমূহ (জানুয়ারি-ডিসেম্বর ২০১৫) ৫টি কম্পোনেন্ট-এর মাধ্যমে কাজ বাস্তবায়িত হচ্ছে। এছাড়া প্রকল্প সম্পর্কিত বিভিন্ন সমীক্ষা, যেমন- Satisfaction Survey, Tracer Study, Impact Study ইত্যাদি পরিচালনার কাজ করা হচ্ছে। উচ্চশিক্ষার গুণগত মান উন্নয়নে ইউসিজির গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে।

[উৎস: বাংলাদেশ বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশন প্রতিবেদন- ২০১৫]

পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ৪.৪

ক. বহু নির্বাচনী প্রশ্ন

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন।

১. কত সালে বাংলাদেশ বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশন প্রতিষ্ঠিত হয়?
   ক. ১৯৭২ খ্রী:
   খ. ১৯৭৩ খ্রী:
   গ. ১৯৭৪ খ্রী:
   ঘ. ১৯৭৫ খ্রী:

২. কমিশনের মোট সদস্য সংখ্যা কত?
   ক. ৯ জন
   খ. ১২ জন
   গ. ১৫ জন
   ঘ. ১৮ জন

৩. ইউসিজির বিভাগের সংখ্যা কত?
   ক. ২টি
   খ. ৪টি
   গ. ৬টি
   ঘ. ৮টি

উত্তরমালা: ১. খ, ২. গ, ৩. ঘ

খ. সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন

১. ইউসিজির গঠন প্রণালী লিখুন।
২. ইউসিজির কর্মকর্তা ও কর্মচারীর বিবরণ দিন।

গ. রচনামূলক প্রশ্ন

১. ইউসিজির দায়িত্বসমূহ লিখুন।
২. ইউসিজির কর্মবিভাজনের বর্ণণা দিন।
৩. শিক্ষার মানোন্নয়নে ইউসিজির ভূমিকা ব্যাখ্যা করুন।

পাঠ ৪.৫: উচ্চশিক্ষায় প্রধান প্রধান বিবেচ্য দিকসমূহ (ইস্যু) ও প্রতিবন্ধকতাসমূহ

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি–

- উচ্চশিক্ষার প্রধান প্রধান ইস্যুসমূহ উল্লেখ করতে পারবেন।
- উচ্চশিক্ষার মানসম্মত ও গুণগত শিক্ষা অর্জনের প্রতিবন্ধকতাসমূহ বিশ্লেষণ করতে পারবেন।

বর্তমান সরকার উচ্চশিক্ষার বিস্তার ও প্রসারে দেশের প্রত্যেকটি জেলার অন্তত পক্ষে একটি করে বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে এবং সরকারি উদ্যোগের পাশাপাশি বেসরকারি ভাবে বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠায় উৎসাহ দিয়ে যাচ্ছে। দেশের ৩৮টি সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়, ৮৩টি বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় এবং জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় অঙ্গীভূত ও অধিভূত কলেজসমূহের মাধ্যমে শিক্ষার্থীরা উচ্চশিক্ষা গ্রহণ করে চলছে। উচ্চশিক্ষা ক্ষেত্রে সমস্যাও রয়েছে। প্রধান ইস্যুসমূহ নিম্নরূপ:

১. শিক্ষাক্রম যুযোগপযোগী এবং বাস্তবসম্মত করা;
২. গবেষণা কার্যক্রমকে যুগোপযোগী করা;
৩. পরীক্ষা পদ্ধতির সংস্কার করা;
৪. মানসম্মত শিক্ষার প্রতি গুরুত্ব দেওয়া;
৫. উচ্চশিক্ষা খাতে বাজেট বরাদ্দ বৃদ্ধি করা;
৬. সেশন জট হ্রাস করা;
৭. মেধাবী শিক্ষার্থীদের জন্য বিশেষ বৃত্তি ব্যবস্থা করা;
৮. শিক্ষকদের দায়িত্ব ও কর্তব্য পালনে যথাযথ নিয়মনীতি অনুসরণে পরামর্শ দেওয়া;
৯. মানসম্পন্ন ও গুনগত শিক্ষার নিশ্চিতকরণে যোগ্যতম শিক্ষক নিয়োগ ও প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা;
১০. জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ে অধিভূক্ত স্নাতকোত্তর কলেজসমূহে উচ্চতর পদসমূহে পর্যাপ্ত সংখ্যক যোগ্য শিক্ষক নিয়োগের ব্যবস্থা করা;
১১. বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষার গুণগতমান বৃদ্ধির লক্ষ্যে বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশনের নীতিমালা যথাযথভাবে অনুসরণের ব্যবস্থা করা;
১২. শিক্ষার্থী যাতে বিশ্ববিদ্যালয়ে অধিক সংখ্যক ভর্তি হতে পারে, এজন্য সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে দুই শিফট চালু করা যেতে পারে; এবং
১৩. জঙ্গি তৎপরতা রোধে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা।

এছাড়া শিক্ষার্থী ভাষাজ্ঞানের অভাব দূর করে বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষা গ্রহণের জন্য তাদের উপযোগী করে তোলার ব্যবস্থা গ্রহণ এবং ভৌত অবকাঠামোর জন্য প্রয়োজনীয় অর্থ বরাদ্দ দেওয়ার ব্যবস্থা করা। এসব ইস্যুসমূহই শিক্ষার মানসম্মত ও গুণগত শিক্ষা অর্জনের প্রতিবন্ধকতা বা চ্যালেঞ্জ। নিম্নে এসব চ্যালেঞ্জসমূহ আলোচনা করা হলোঃ

১. **শিক্ষাক্রম:** দেশের অধিকাংশ বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রচলিত কারিকুলাম উন্নতমানের হলেও কোনো কোনো বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বিশেষ করে কতিপয় বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় এবং জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনস্থ কলেজ থেকে পাস করা স্নাতকগণের শিক্ষারমান কাঙ্খিত পর্যায়ে উন্নত হয়নি।

সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়সমূহ কারিকুলাম নিয়মিত পর্যালোচনা ও সংশোধনের রীতি প্রচলিত রয়েছে। বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের কারিকুলাম যুগের চাহিদা অনুযায়ী প্রণয়ন ও সংশোধন করা হয়ে থাকে। কারিকুলাম বাস্তবায়নের পূর্বে কমিশনের অনুমোদন নেওয়া বাধ্যতামূলক এবং অনুমোদিত সিলেবাস প্রতি ৪ বছর অন্তর প্রয়োজনীয় সংশোধনীর জন্য কমিশন পরামর্শ দিয়ে থাকে। তবে এ জন্য প্রয়োজন সুনির্দিষ্ট বিধিমালা। বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষার মান উন্নয়ন ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে উন্নীতকরণের লক্ষ্যে ২০১০ সালের বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় আইন অনুযায়ী "Accreditation Council" গঠনের জন্য একটি খসড়া নীতিমালা কমিশন কর্তৃক শিক্ষা মন্ত্রণালয়ে জমা দেওয়া হয়েছে। শীঘ্রই এই খসড়া নীতিমালা পর্যালোচনা এবং প্রয়োজনে সংশোধন করে "Accreditation Council" প্রতিষ্ঠা করার জন্য সরকারের নিকট সুপারিশ করা হয়েছে। সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের জন্য "Accreditation" বাধ্যতামূলক না হলেও শিক্ষার্থীদের স্বার্থ বিবেচনা করে স্বতঃপ্রণোদিত হয়ে কারিকুলাম Accreditation-এর উদ্যোগ গ্রহণের জন্য পরামর্শ দেওয়া হয়। জ্ঞান এবং কর্মের সংমিশ্রণে মানবীয় গুণাবলি ও পেশাগত দক্ষতা অর্জন প্রত্যেক নাগরিকের জন্যে অপরিহার্য। মানব কল্যাণে আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থায় জাতি-ধর্ম-বর্ণ-গোত্র নির্বিশেষে সকল মতের ও আদর্শের প্রতিফলন থাকা সমীচীন। প্রতিটি বিশ্ববিদ্যালয় রাষ্ট্রের সকল নাগরিকের উচ্চশিক্ষার অধিকার নিশ্চিত করবে- এটাই বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের উদ্দেশ্য হওয়া বাঞ্ছনীয়। শিক্ষার বিস্তার, জ্ঞান-বিজ্ঞানের সকল শাখায় যুগোপযোগী পাঠ্যসূচি প্রণয়ন, মানসম্মত শিক্ষাদান এবং সকল নাগরিকের নিকট উচ্চশিক্ষা সহজলভ্য করে তথ্য-প্রযুক্তিসমৃদ্ধ দক্ষ জনশক্তি সৃষ্টির লক্ষে প্রতিটি বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠ্যক্রম প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন আবশ্যক।

২. **গবেষণা:** একবিংশ শতাব্দীর চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় এবং উন্নত বিশ্বের সাথে প্রতিযোগতিায় টিকে থাকার লক্ষে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিভিত্তিক দক্ষ জনশক্তি সৃষ্টি করতে হয়। তাই বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের পাঠ্যক্রমে যুগের চাহিদার নিরিখে আধুনিক গবেষণাগার সমৃদ্ধ বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি সম্পর্কিত বিষয় অন্তর্ভূক্ত করা প্রয়োজন। একই সাথে বিদ্যমান গবেষণাগার, গবেষণা প্রতিষ্ঠান ও ইনস্টিটিউটসমূহকে সুসংহত ও আধুনিকায়ন করা আবশ্যক এবং বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের নিজস্ব উদ্যোগে গবেষণাগার স্থাপন বা উন্নয়নে সরকারি সহযোগিতার পাশাপাশি শিল্প-কারখানা ও ব্যবসাভিত্তিক দেশীয় ও আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠান বা সংস্থার সাথে গবেষণামূলক কাজে সম্পৃক্ততা গড়ে তোলার উদ্যোগ নেওয়া দরকার।

৩. **পরীক্ষা পদ্ধতি:** বাংলাদেশের অধিকাংশ বিশ্ববিদ্যালয়ে বর্তমানে ৪ বছর মেয়াদি স্নাতক ডিগ্রি কোর্স চালু রয়েছে। তবে কোনো কোনো বিশ্ববিদ্যালয়ে বার্ষিক পদ্ধতি এবং কোনো কোনো বিশ্ববিদ্যালয়ে সিমেস্টার পদ্ধতি অনুসরণ করা হচ্ছে। আবার কোনো কোনো বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে বছরে তিনটি সিমেস্টার পদ্ধতিও চালু রয়েছে। এ ক্ষেত্রে সকল বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্যে একটি সমন্বিত পদ্ধতি এবং সিলেবাসের মধ্যে সামঞ্জস্য থাকা বাঞ্ছনীয়, যাতে শিক্ষার্থীরা "ক্রেডিট" স্থানান্তরের মাধ্যমে বিশ্ববিদ্যালয় পরিবর্তনের সুযোগ পায়।

পরীক্ষা পদ্ধতি শিক্ষার্থীদের অর্জিত ডিগ্রির মান নির্দেশে মূখ্য ভূমিকা রাখে। বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের মধ্যে প্রচলিত পরীক্ষা পদ্ধতিতে ব্যাপক পার্থক্য রয়েছে। দেশের পুরানো খ্যাতিমান বিশ্ববিদ্যালয়সমূহে বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই প্রাচীন 'দুই পরীক্ষক' পদ্ধতি চালু রয়েছে। এই পদ্ধতিতে কোর্স শিক্ষক ব্যতীত একজন বহিঃস্থ শিক্ষক পৃথকভাবে উত্তরপত্র মূল্যায়ন করে থাকেন। যেহেতু উত্তরপত্রে কোন ধরণের চিহ্ন প্রদান নিষিদ্ধ, তাই একদিকে মূল্যায়ন প্রক্রিয়া যেমন কঠিন, তেমনি মূল্যায়নে দায়িত্বশীলতাও নিশ্চিত করা সম্ভব হয় না। সীমিত সংখ্যক শিক্ষার্থীর জন্য প্রণীত প্রায় শত বছরের পুরানো এই পদ্ধতি বর্তমান প্রয়োজন মেটাতে সক্ষম নয়। বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়সমূহে প্রচলিত পরীক্ষা পদ্ধতি সম্পর্কে কমিশন সম্পূর্ণভাবে ওয়াকেবহাল নয়। তবে এই তথ্য রয়েছে যে, কোর্স শিক্ষকই একমাত্র প্রশ্নপত্র প্রণেতা এবং উত্তরপত্র

মূল্যায়নকারী। এই ধরণের পদ্ধতিতে একজন বহিঃস্থ বিশেষজ্ঞ দ্বারা প্রশ্নপত্রের মান এবং মূল্যায়নের যথার্থতা যাচাই করার পদ্ধতি প্রবর্তন করা আবশ্যক।

৪. **মানসম্মত শিক্ষা:** চার বছর মেয়াদী স্নাতক ডিগ্রী 'প্রান্তিক ডিগ্রি' হিসেবে গণ্য করা হয়, সেহেতু মাস্টার্স পর্যায়ে শিক্ষা-কার্যক্রম কেবলমাত্র বাছাইকৃত মেধাবী স্নাতকদের জন্য উন্মুক্ত রাখা কাম্য; কিন্তু কোন বিশ্ববিদ্যালয়ই এই নীতি অনুসরণ করছে না। ফলে মাস্টার্স পর্যায়ে উচ্চশিক্ষার কাঙ্খিত গুণগত মান নিশ্চিত করা সম্ভব হচ্ছে না এবং সত্যিকারের মেধাবী শিক্ষার্থীরা উচ্চমানের শিক্ষা লাভ থেকে বঞ্চিত হচ্ছে। অনেক সরকারি ও বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় এবং বিশ্ববিদ্যালয় কলেজসমূহ স্নাতক পর্যায়ে শিক্ষা কার্যক্রম পরিচালনার জন্যে পর্যাপ্ত অবকাঠামোগত সুযোগ সুবিধা এবং যোগ্যতাসম্পন্ন শিক্ষক না থাকা সত্ত্বেও মাস্টার্স ডিগ্রি প্রোগ্রাম চালু করা হয়েছে। ফলে এই সকল প্রতিষ্ঠানে মাস্টার্স পর্যায়ে মানসম্মত শিক্ষাদান হচ্ছে না। মাস্টার্স পর্যায়ে ডিগ্রি প্রোগ্রাম কেবলমাত্র উপযুক্ত সুযোগ-সুবিধা সমন্বিত প্রতিষ্ঠানে মেধাবী শিক্ষার্থীদের জন্য সীমিত রাখার লক্ষ্যে সকল বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি দিতে হবে। এজন্য অবকাঠামোগত উন্নয়নে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

প্রতি বছর দেশের সদ্য-স্নাতক ডিগ্রিপ্রাপ্ত সেরা শিক্ষার্থীরা পোস্টগ্রাজুয়েট শিক্ষার জন্যে দেশ ত্যাগ করছেন; তাঁদের বেশিরভাই দেশে ফিরেছেন না। ফলে দেশ এইসব মেধাবী তরুণদের সেবা থেকে বঞ্চিত হচ্ছে এবং দেশে এম.ফিল ও পিএইচ.ডি পর্যায়ে গবেষণার উৎকর্ষ সাধন ব্যাহত হচ্ছে। দেশের সেরা মেধাবী স্নাতকগণকে দেশেই পোস্ট গ্রাজুয়েট শিক্ষা গ্রহণে আকৃষ্ট করার লক্ষ্যে (১) উচ্চতর গবেষণার সুযোগ-সুবিধা উন্নয়ন এবং (২) শিক্ষার্থীদের জন্য আকর্ষণীয় বৃত্তি প্রবর্তন করা প্রয়োজন।

৫. **উচ্চশিক্ষা খাতে বাজেট বরাদ্দ:** বাংলাদেশে উচ্চশিক্ষা খাতে সরকারি বরাদ্দ জাতীয় বাজেটের ০.৬৫ শতাংশ। এই বাজেট বরাদ্দ বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের ন্যূনতম চাহিদা মেটাতে সক্ষম হচ্ছে না। কমিশন বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের প্রস্তাবিত বাজেট সংশোধন করে যে চূড়ান্ত বাজেট সরকারের নিকট পেশ করে, সেটিও বহুলাংশে আবার শিক্ষা মন্ত্রণালয় কর্তৃক সংশোধন করা হয়। সুতরাং মঞ্জুরী কমিশনের পক্ষে বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের ন্যূনতম চাহিদা মেটানো সম্ভব হয় না। এমতাবস্থায় জাতীয় বাজেটে উচ্চশিক্ষা খাতে বরাদ্দ চিহ্নিত করে মঞ্জুরী কমিশন কর্তৃক চাহিত অর্থ সংস্থান ব্যবস্থা গ্রহণ করা।

৬. **সেশন জটঃ** দেশের কতিপয় সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে একাডেমিক সেশন আশঙ্কা জনকভাবে পিছিয়ে পড়েছে; এর ফলে একদিকে যেমন শিক্ষার্থী ও তাদের অভিভাবকগণ আর্থিকভাবে ক্ষতিগ্রস্থ হচ্ছেন, অন্যদিকে সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় সম্পদেরও প্রচুর অপচয় হচ্ছে। ফলে মানবসম্পদ উন্নয়নে জাতীয় লক্ষ্যমাত্রা অর্জন মারাত্মকভাবে ব্যাহত হচ্ছে। এ কথা সত্য যে, সেশন জট সৃষ্টির সবক'টি কারণ বিশ্ববিদ্যালয়ের অভ্যন্তরীণ নয় এবং তা নিরসন করাও বিশ্ববিদ্যালয়ের একক কর্তৃত্বাধীন নয়। তবে এ কথা অনস্বীকার্য যে, কারিকুলাম বাস্তবায়নের পদ্ধতি, বিশেষ করে পরীক্ষা পদ্ধতি এবং পরীক্ষার ফল প্রকাশে অনাকাঙ্খিত বিলম্ব ইত্যাদি এই সেশন জটের জন্য বহুলাংশে দায়ী। পরীক্ষা পদ্ধতি যুগোপযোগী করে একাডেমিক ক্যালেন্ডার অনুযায়ী পরীক্ষার ফল প্রকাশ নিশ্চিত করা যেতে পারে।

৭. **বিশেষ বৃত্তি ব্যবস্থা:** দেশের সেরা মেধাবী শিক্ষার্থীরা প্রতিযোগিতার মাধ্যমে বিশ্ববিদ্যালয়সমূহে ভর্তির সুযোগ পায়। তাদের বেতন এবং আবাসিক হলের সিট ভাড়া নগণ্য হলেও একজন শিক্ষার্থীর শিক্ষাকার্যক্রমসহ দৈনন্দিন জীবনে যে পরিমাণ অর্থের প্রয়োজন হয়, বেশিরভাগ অভিভাবকের পক্ষেই সে পরিমাণ অর্থ যোগান দেয়া সম্ভব হয় না। আবার মেধাবী শিক্ষার্থীদের সরকার থেকে যে পরিমাণ বৃত্তির অর্থ প্রদান করা হয়, তা একেবারেই অপ্রতুল। ফলে খরচ মেটানোর জন্য অধিকাংশ শিক্ষার্থী গৃহশিক্ষকতার পেশায় নিজেকে সম্পৃক্ত করেন। এতে শিক্ষার্থীদের নিয়মিত পড়াশোনায় ব্যাঘাত ঘটে এবং তাদের মধ্যে পরীক্ষা পেছানোর প্রবণতা জেগে উঠে। এই প্রবণতা বুয়েটসহ বিভিন্ন সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে সেশন জটের

একটি অন্যতম কারণ বলে প্রতীয়মান হয়। মেধাবী শিক্ষার্থীদের জন্য বিশেষ বৃত্তি প্রবর্তন করা প্রয়োজন, যাতে বৃত্তির অর্থ তার পড়াশোনার ব্যয় মেটানোর জন্য যথেষ্ট হয়।

৮. **শিক্ষকের দায়িত্বঃ** সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষকদের যোগ্যতা সাধারণ বিবেচনায় অত্যন্ত উঁচু মানের। বেশিরভাগ শিক্ষকই নিষ্ঠাবান; তাঁদের অবদান জাতীয় উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে। তবে কিছু সংখ্যক শিক্ষকের বিরুদ্ধে কর্তব্যে অবহেলার অভিযোগ রয়েছে। একজন শিক্ষককে প্রতি সপ্তাহে কত ঘন্টা ক্লাস নিতে হবে– এই ব্যাপারে নিজস্ব নিয়ম থাকলেও প্রথমত: এর সঠিক বাস্তবায়ন হয় না এবং দ্বিতীয়ত: এই নিয়মের সঠিক ব্যাখ্যাও নেই। তাছাড়া স্বাভাবিক অবস্থায় একটি বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রতি একাডেমিক সেশনে অর্থাৎ প্রতি বছর ৩০-৩২ সপ্তাহ ক্লাস অনুষ্ঠিত হয় এবং বাকি সময় ছুটি থাকে। ক্লাস নেয়া ব্যতীত অন্যান্য কাজের জন্যে যেমন- গবেষণা, প্রশাসন ও শিক্ষক-শিক্ষার্থীদের মধ্যে আলোচনা ইত্যাদি কাজের জন্য কত সময় একজন শিক্ষককে তাঁর কর্মস্থলে অনুপস্থিত থাকেন। অনেক বিশ্ববিদ্যালয়ে শ্রেণিকক্ষসহ শিক্ষকদের অফিসকক্ষ দুপুরের পর তালাবদ্ধ থাকে বলে অভিযোগ রয়েছে। ফলে শিক্ষার্থীসমাজ এবং সাধারণ জনগণের মধ্যে শিক্ষকদের সম্পর্কে একটি নেতিবাচক ধারণা জন্মেছে। এছাড়া অনেক শিক্ষকের বিরুদ্ধে পরীক্ষার উত্তরপত্র বিলম্বে মূল্যায়ন করার অভিযোগ রয়েছ যে, তাঁরা একাধিক বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে খন্ডকালীন শিক্ষক হিসেবে কাজ করেন এবং নিজ নিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের চেয়ে ঐ সকল বিশ্ববিদ্যালয়ের পিছনে অধিকতর সময় ব্যয় করেন। সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন শিক্ষক খন্ডকালীন শিক্ষক হিসেবে অন্য কোন বিশ্ববিদ্যালয়ে বা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে কত সময় বা কতটুকু দায়িত্ব বহন করতে পারেন, সেই বিষয়ে কোন সুনির্দিষ্ট নীতিমালা নেই। তাই শিক্ষকদের দায়িত্ব প্রতিপালন এবং সার্বিক আচরণের উপর সুনির্দিষ্ট নীতিমালা প্রণয়ন ও এর সাথে যথাযথ বাস্তবায়নের উদ্যোগ গ্রহণ করা বাঞ্ছনীয়।

৯. **শিক্ষক নিয়োগ ও প্রশিক্ষণঃ** মানসম্পন্ন ও গুণগত শিক্ষা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয় ও বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশনের যৌথ উদ্যোগে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে বিভিন্ন কনফারেন্স-ওয়ার্কশপ-সেমিনার ও সিম্পোজিয়াম ইত্যাদি আয়োজনের ব্যবস্থা গ্রহণ করা যেতে পারে।

বিশ্ববিদ্যালয় Entry Level-এ শিক্ষক নিয়োগের ক্ষেত্রে মেধা, দক্ষতা ও যোগ্যতাকে প্রাধান্য দিয়ে বিশেষজ্ঞ প্যানেল ও পুল গঠন করে একটি স্বচ্ছ ও গ্রহণযোগ্য লিখিত ও মৌখিক পরীক্ষার পাশাপাশি ক্লাস ডেমোনেস্ট্রেশন ব্যবস্থার মাধ্যমে শিক্ষক নিয়োগ প্রক্রিয়া সম্পন্ন করা যেতে পারে।

বিশ্ববিদ্যালয়সমূহে শিক্ষার গুণগতমান নিশ্চিত করার লক্ষ্যে দেশের মেধাবী শিক্ষার্থীদের শিক্ষকতার পেশায় আকৃষ্ট করার লক্ষ্যে চাকুরির সুযোগ-সুবিধা বৃদ্ধিকরণের পাশাপাশি আকর্ষণীয় বেতন কাঠামো প্রবর্তন করা বাঞ্ছনীয়।

তাছাড়া পেশাগত উন্নয়নের লক্ষ্যে শিক্ষক প্রশিক্ষণ (ইন-সার্ভিস) বুনিয়াদি ও বিষয়ভিত্তিক প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা জোরদার করা। এ লক্ষ্যে বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক-প্রশিক্ষণ একাডেমি গড়ে তোলার ব্যবস্থা করা যেতে পারে।

১০. **জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ঃ** জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় আইন (১৯৯২ সনের ৩৭নং আইন) জারির সঙ্গে সঙ্গে দেশের সকল ডিগ্রী কলেজ এই বিশ্ববিদ্যালয়ের আওতায় আসে এবং এই আইন জাতীয় সংসদে গৃহীত হওয়ার মধ্য দিয়ে কৃষি, প্রকৌশল ও মেডিকেল শিক্ষা ব্যতিরেকে দেশের সকল ডিগ্রী কলেজ আইন, শিক্ষা, ফাইন আর্টস কলেজসমূহ মেরিন ফিশারিজ একাডেমি প্রভৃতি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের অধিভূক্ত হয়। (অবশ্য বর্তমানে সামরিক বাহিনীর বিভিন্ন একাডেমি বাংলাদেশ প্রফেশনাল বিশ্ববিদ্যালয়ের এবং বাংলাদেশ নেভাল একাডেমি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেরিটাইম বিশ্ববিদ্যালয়ের আওতাধীন রয়েছে)। ঢাকা মহানগরী থেকে ৩৫ কিলোমিটার দূরে গাজীপুরে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাস অবস্থিত। জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের অধিভূক্ত কলেজ বা প্রতিষ্ঠানসমূহের মাধ্যমে বিএ, বিএসএস, বিকম (পাস ও অনার্স), এমএ, এমএসএস, এমএসসি, এমকম, বিএড, বিপিএড, এলএলবি, বিবিএ এবং সমমানের বিভিন্ন কোর্সে শিক্ষা কার্যক্রম

পরিচালনা করে আসছে। বিশ লক্ষাধিক ছাত্র-ছাত্রী এসব কোর্সে অধ্যয়ন করছে। কলা, সামাজিক বিজ্ঞান, বিজ্ঞান ও বাণিজ্য বিষয়ে স্নাতক (পাস) ডিগ্রী প্রদানের ক্ষেত্রে এটি দেশের একমাত্র বিশ্ববিদ্যালয়। এ ছাড়া স্নাতক সম্মান ও স্নাতকোত্তর পর্যায়ে বিভিন্ন বিষয়ের ওপর দেশের বিপুল সংখ্যক ছাত্র-ছাত্রী এ প্রতিষ্ঠান থেকে ডিগ্রী অর্জন করে থাকে। ২০১৫ সালে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় থেকে প্রাপ্ত তথ্য-উপাত্ত বিশ্লেষণ করে দেখা গেছে যে, উচ্চতর পদসমূহে পর্যাপ্ত সংখ্যক যোগ্য শিক্ষক নিয়োগ দিলে স্নাতকোত্তর পর্যায়ে শিক্ষার গুণগতমান বর্তমানের চেয়ে আরও উন্নততর করা সম্ভব হবে।

১১. **বে-সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ঃ** বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের ভর্তি প্রক্রিয়াকে আরো স্বচ্ছ, মেধাভিত্তিক ও বিধিসম্মত করা আবশ্যক। একই সাথে বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের অবকাঠামো, শিক্ষকমন্ডলী ও পরিবেশগত বিষয়ে অধিকতর সুযোগ-সুবিধা সৃষ্টির উদ্দেশ্যে সচেষ্ট হওয়ার পাশাপাশি শিক্ষক নিয়োগের ক্ষেত্রে বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশনের নীতিমালা মেনে চলার বিষয়টি নিশ্চিতকরণ এজন্য তদারকি বৃদ্ধি করা। ১৫/২০ বছরের পুরানো অনেক বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে উপাচার্য, উপ-উপাচার্য ও কোষাধ্যক্ষ নেই। এ ব্যাপারে অতিদ্রুত ব্যবস্থা গ্রহণ করা।

বিশ্ব ব্যাংক এবং জাতীয় আন্তর্জাতিক ব্যক্তিবর্গের জরিপ অভিমত অনুযায়ী বাংলাদেশের সকল বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের সার্বিক অবস্থা অতি উত্তম মানের নয়। কতিপয় বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের সার্বিক অবস্থা এমন পর্যায়ের যাদেরকে কোন অবস্থারই পূর্ণাঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয় বলা যায় না। এসব বিশ্ববিদ্যালয়গুলোকে হয় তাদের উচ্চশিক্ষা গ্রহণের ক্ষেত্রে কাঙ্খিত মান আনয়ন করতে হবে, গুণগত মান বৃদ্ধি করতে হবে নতুবা বন্ধ করে দিতে হবে তাদের অনুমোদন বাতিল করতে হবে। এক্ষেত্রে সরকারি এবং বেসরকারি উদ্যোগ সমন্বিত করে কাজ করতে হবে। কারণ উচ্চশিক্ষা ক্ষেত্রে প্রহসন করা চলবে না। শিক্ষায় জালিয়াতি করা যাবে না। শুধুমাত্র সাইন বোর্ড স্বর্বস্ব বিশ্ববিদ্যালয় পরিচালনা করা যাবে না। উচ্চশিক্ষা সনদ বিক্রি কার্যক্রম অবশ্যই বন্ধ করতে হবে। শিক্ষায় প্রতারণা কোন জাতির উন্নয়নের জন্য কোন অবস্থায় কাম্য নয়। উচ্চশিক্ষার এসব প্রতিষ্ঠানগুলোর মান উন্নয়নের একান্ত প্রয়োজন।

১২. **শিক্ষার্থীর ভর্তির সমস্যাঃ** উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ ছাত্র-ছাত্রীদের উন্নতমানের শিক্ষার সুযোগ বৃদ্ধি করার জন্যে সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে দুই শিফট চালু করার ব্যাপারে চিন্তা-ভাবনা করা উচিত। প্রথম শিফট এর থিউরি ক্লাশ সকাল ৮টা থেকে দুপুর ১টা এবং বেলা ২টা- বিকাল ৫টা পর্যন্ত প্র্যাকটিক্যাল করানো যেতে পারা যায় এবং দ্বিতীয় শিফটি'র থিওরি ক্লাস দুপুর ২টা- সন্ধ্যা ৭টা পর্যন্ত এবং সকাল ৮টা থেকে দুপুর ১টা পর্যন্ত প্যাকটিক্যাল ক্লাস করা যায়। এর জন্যে শিক্ষক-শিক্ষিকার সংখ্যা বৃদ্ধি করতে হবে অথবা শিক্ষক-শিক্ষিকাদেরকে নির্দিষ্ট ক্লাসের পরে অতিরিক্ত ক্লাশের জন্য বাড়তি সম্মানি দেয়া যেতে পারে। তাহলে শিক্ষক-শিক্ষিকার সংখ্যা খুব বেশি বৃদ্ধি করতে হবে না। এই ব্যবস্থা কার্যকর হলে দুইগুণ ছাত্র-ছাত্রীদেরকে ভর্তি করা সম্ভব। এটা ছাড়াও আপাতত ভর্তি পরীক্ষার নিয়ম প্রবর্তন করার চিন্তা-ভাবনা করা যায়। ভবিষ্যতে Unified Admission Test করার চিন্তা-ভাবনা করা যায়। ভর্তি পরীক্ষার নতুন নিয়ম কার্যকর করা গেলে ছাত্র-ছাত্রীরা অনেক দুর্ভোগের হাত থেকে রক্ষা পাবে।

১৩. **জঙ্গি তৎপরতা রোধঃ** সম্প্রতি দেশে ব্যাপক জঙ্গি তৎপরতা উচ্চশিক্ষা ক্ষেত্রেও উদ্বেগের কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। এ জন্য প্রতিটি কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ে জঙ্গি তৎপরতা প্রতিরোধ কমিটি গঠন এবং নিয়মিত পর্যবেক্ষণ করা জরুরি। পাশাপাশি বিভিন্ন সামাজিক ও সাংস্কৃতিক কর্মকান্ড বাড়ানো উচিত। প্রয়োজনে বিশ্ববিদ্যালয়ে এতদসংক্রান্ত নন-ক্রেডিট কোর্স বাধ্যতামূলক করে এই ক্ষেত্রে পাঠদানকারী শিক্ষক ও লোকবল বাড়ানোর পদক্ষেপ নেওয়া যেতে পারে।

জঙ্গি তৎপরতা প্রতিরোধ কমিটি সরকার/শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের কাছে ফান্ড চাইতে পারে। মানবিক, সাংস্কৃতিক ও নৈতিক মূল্যবোধ জাগ্রতের জন্য বাংলা, ইতিহাস, ভাষা আন্দোলন, মুক্তিযুদ্ধ, খেলাধুলা ইত্যাদি এক্সট্রা

কারিকুলাম কার্যক্রম প্রবর্তন ও ছাত্র-শিক্ষক সম্পর্ক উন্নয়নের জন্য কাউন্সিলিং ও মনোচিকিৎসক নিয়োগ দেওয়া যেতে পারে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ৪.৫

ক. বহু নির্বাচনী প্রশ্ন

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন।

১. কত সালে বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় আইনে Accreditation Council গঠনের কথা বলা হয়েছে?
ক. ২০০৮ খ্রী:
খ. ২০০৯ খ্রী:
গ. ২০১০ খ্রী:
ঘ. ২০১১ খ্রী:

২. ২০১৫ সালে বাংলাদেশে উচ্চশিক্ষা খাতে সরকারি বরাদ্দ জাতীয় বাজেটের কত শতাংশ ছিল?
ক. ০.৪৫ শতাংশ
খ. ০.৫৫ শতাংশ
গ. ০.৬৫ শতাংশ
ঘ. ০.৭৫ শতাংশ

উত্তরমালা: ১. গ, ২. গ

খ. সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন

১. উচ্চশিক্ষার প্রধান প্রধান ইস্যুসমূহ চিহ্নিত করুন।

গ. রচনামূলক প্রশ্ন

১. উচ্চশিক্ষায় চ্যালেঞ্জ বা প্রতিবন্ধকতাসমূহ চিহ্নিত করুন।
২. উচ্চশিক্ষায় মানসম্মত ও গুণগত শিক্ষা বৃদ্ধির লক্ষ্যে আপনার মতামত দিন।